জুলাই ২০১৩, আষাঢ়-শ্রাবণ ১৪২০

বাংলাদেশ ব্যাংক পরিক্রমা

নতুন সাজে বাংলাদেশ ব্যাংক পরিক্রমার
প্রথম বর্ষপূর্তিতে সংশ্লিষ্টদের
জন্য রইল শুভকামনা।
আশা করি, এ পত্রিকার পাঠকপ্রিয়তা
দিন দিন বৃদ্ধি পাবে।

আতিউর রহমান
গভর্নর

নতুন সাজে ১ বছর

বর্তমানে বাংলাদেশ ব্যাংকে তথ্য-প্রযুক্তির যে ব্যাপক প্রসার হয়েছে, তা আমাদের সময় ছিল না

মোঃ হারুনর রশীদ ভূঞা
প্রাক্তন নির্বাহী পরিচালক, বাংলাদেশ ব্যাংক

মোঃ হারুনর রশীদ ভূঞা ১৯৭০ সালের ৫ মে তৎকালীন স্টেট ব্যাংক অব পাকিস্তান এ কর্মজীবন শুরু করেন। প্রায় ৩৪ বছরের কর্মজীবন শেষে ২০০৪ সালের ১৭ এপ্রিল চূড়ান্ত অবসর গ্রহণ করেন। ব্যাংক পরিক্রমার ধারাবাহিক 'স্মৃতিময় দিনগুলো'র এবারের অতিথি প্রাক্তন এই নির্বাহী পরিচালক।

অবসর সময় কিভাবে কাটছে?

আমি ২০০৪ সালের এপ্রিল মাসে বাংলাদেশ ব্যাংক হতে চূড়ান্তভাবে অবসর নেই। এরপর প্রায় দুই বছর আমার অসুস্থ স্ত্রীকে দেখাশোনা করতে হয়েছে। তাঁর দুটি কিডনীই সম্পূর্ণ বিকল হয়ে গিয়েছিলো এবং সেজন্যে তাঁকে সপ্তাহে তিনদিন ঢাকার বারডেম হাসপাতালে ডায়ালাইসিস করাতে হতো। ২০০৬ সালে তিনি ইন্তেকাল করেন। এর দুই বছর পূর্বে আমার দুই ছেলের মধ্যে ছোট ছেলেটি (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত) এক দুর্ঘটনায় মৃত্যুবরণ করে। বর্তমানে আমার একমাত্র ছেলে বাংলাদেশ সরকারের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের গবেষণা শাখায় কর্মরত, সে অবিবাহিত। ইতোমধ্যে আমি ঢাকার একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়, দি পিপলস্ ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ এ নভেম্বর ২০০৬ থেকে মে ২০১২ পর্যন্ত রেজিস্ট্রার হিসেবে কর্মরত ছিলাম। তারপর থেকে আমি পুরোপুরি অবসর জীবন কাটাচ্ছি। এখন আমি বই পড়া, ধর্মকর্ম, আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে যোগাযোগে ব্যস্ত থাকি। এছাড়া আমার এলাকার কয়েকটি অরাজনৈতিক সেবামূলক প্রতিষ্ঠানের কাজের সঙ্গেও জড়িত আছি।

চাকরিকালীন কোন বিশেষ অভিজ্ঞতা সম্পর্কে বলুন–

নির্বাহী পরিচালক হিসেবে আমি যখন মতিঝিল অফিসে কর্মরত, তখন বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ছিলেন ড. ফরাসউদ্দীন আহমেদ। তার ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, এ ব্যাংকের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারী এবং তাদের পোষ্যদের হেপাটাইটিস-বি ভাইরাসের টিকা প্রদান করা হবে। এই কর্মসূচি পরিচালনার লক্ষ্যে প্রাথমিক কার্যাদি সম্পন্ন করার দায়িত্ব আমার ওপর অর্পণ করা হয়। এটি ছিল এক বিরাট কর্মযজ্ঞ এবং এটি শুরু করার দায়িত্ব পালন আমার চাকরিকালীন অনেক অভিজ্ঞতার মধ্যে একটি বিশেষ অভিজ্ঞতা বলে আমি মনে করি।

আপনার কর্মরত সময় এবং বর্তমান সময়ের বাংলাদেশ ব্যাংকের মধ্যে কীভাবে তুলনা করবেন?

বর্তমানে বাংলাদেশ ব্যাংকে তথ্য-প্রযুক্তির যে ব্যাপক প্রসার হয়েছে, তা আমাদের সময় ছিল না। বাংলাদেশ ব্যাংকের এই দিকটি আমার দৃষ্টিতে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। এতে করে কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কাজের গতি ও দক্ষতা আগের তুলনায় অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। তাছাড়া, কেন্দ্রীয় ব্যাংকের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালনের লক্ষ্যে আমাদের সময়ের তুলনায় বর্তমানে প্রধান কার্যালয়ে আরো অনেক নতুন বিভাগ এবং দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে কয়েকটি নতুন অফিস প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, যা বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্মকাণ্ডকে পূর্বাপেক্ষা অধিকতর গতিশীল ও যুগোপযোগী করে তুলতে সহায়ক হয়েছে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

আপনি ডিপার্টমেন্ট অব কমিউনিকেশন্স এন্ড পাবলিকেশন্স- এর নির্বাহী পরিচালকের দায়িত্বে ছিলেন, সেই সময়ের স্মরণীয় স্মৃতি উল্লেখ করুন–

আমি নির্বাহী পরিচালক থাকাকালে ঐ বিভাগটির নাম ছিল জনসংযোগ ও প্রকাশনা বিভাগ, এটির অবস্থান ছিল ২য় সংলগ্নী উচ্চ ভবনে। আমি, অন্যান্য নির্বাহী পরিচালক, গভর্নর বর্তমানের মতো তখনো মূল ভবনের চতুর্থ তলায়ই বসতাম। একদিন তৎকালীন অর্থমন্ত্রী সাইফুর রহমান একটি আলোচনা সভার জন্যে ব্যাংকের কনফারেন্স রুমে আসেন। তিনি মূল ভবনের চতুর্থতলার প্রায় প্রতিটি কক্ষে প্রবেশ করেন, নির্বাহী পরিচালকবৃন্দের কাজ ও তাদের প্রত্যেকের অধীনে বিভিন্ন বিভাগের নাম জানতে চান। তার সাথে সাবেক গভর্নর ড. ফখরুদ্দীনও ছিলেন। মন্ত্রী পরিদর্শন শেষে অসন্তোষ প্রকাশ করেন ও প্রশ্ন করেন, নির্বাহী পরিচালকবৃন্দ কেন তাদের নিজ বিভাগে বসেন

(১৭ পৃষ্ঠায় দেখুন)

সম্পাদনা পরিষদ

- **উপদেষ্টা**
  ম. মাহফুজুর রহমান
- **সম্পাদক**
  এফ. এম. মোকাম্মেল হক
- **বিভাগীয় সম্পাদক**
  মোঃ মিজানুর রহমান জোদ্দার
  মোঃ জুলকার নায়েন
  সাঈদা খানম
  মহুয়া মহসীন
  নুরুন্নাহার
  আজিজা বেগম
  ইন্দ্রাণী হক
  বিশ্বজিত বসাক
- **প্রচ্ছদ**
  সৈয়দ লুৎফুল হক
- **গ্রাফিক্স**
  মোহাম্মদ আবু তাহের ভূঁইয়া

... যাঁরা চলে গেলেন

লুৎফর রহমান সরকার
সাবেক গভর্নর

বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর লুৎফর রহমান সরকার ইন্তেকাল করেছেন (ইন্না লিল্লাহি......... রাজিউন)। ২৪ জুন ২০১৩ রাজধানীর একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৮০ বছর। তিনি বার্ধক্যজনিত রোগে ভুগছিলেন।
লুৎফর রহমান সরকার ১৯৯৬ থেকে ১৯৯৮ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নরের দায়িত্ব পালন করেন। খ্যাতিমান এই ব্যাংকারের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেছেন মহামান্য রাষ্ট্রপতি আবদুল হামিদ ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আতিউর রহমান তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে তাঁর পরিবারের সদস্যদের কাছে শোকবাণী পাঠিয়েছেন। শোকবাণীতে ড. আতিউর রহমান বলেন, 'জনাব লুৎফর রহমান অসামান্য মনীষায় দেশে দক্ষ ও আধুনিক ব্যাংকিং সৃষ্টিতে সারা জীবন নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে গেছেন। তাঁর আকস্মিক মৃত্যুতে আমি আমার ও বাংলাদেশ ব্যাংকের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীর পক্ষ থেকে গভীর শোক প্রকাশ করছি। তাঁর এ শূন্যতা কখনো পূরণ হবার নয়। আমি মরহুমের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি।' ২৪ জুন দুপুরে মরহুমের জানাজা বাংলাদেশ ব্যাংক চত্বরে অনুষ্ঠিত হয়। জানাজায় বাংলাদেশ ব্যাংকের সকল স্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারী অংশ নেন।

মোঃ সাহাদাত হোসেন খান
প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক
বাংলাদেশ ব্যাংক অফিসার্স ওয়েলফেয়ার কাউন্সিল

বাংলাদেশ ব্যাংক অফিসার্স ওয়েলফেয়ার কাউন্সিল এর প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক মোঃ সাহাদাত হোসেন খান ঢাকার একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ২২ জুন ২০১৩ ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি.....রাজিউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল প্রায় ৫৯ বছর। তিনি বাংলাদেশ ব্যাংকের সিকিউরিটি ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্ট এর উপ পরিচালক হিসেবে কর্মরত ছিলেন। গভর্নর ড. আতিউর রহমান তাঁর মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেন এবং শোক সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানান। ২৩ জুন বাংলাদেশ ব্যাংক প্রধান কার্যালয় চত্বরে মরহুমের জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। জানাজায় বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর, নির্বাহী পরিচালকসহ ব্যাংকের সকল স্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারী অংশ নেন।
মোঃ সাহাদাত হোসেন খান ৬ জুন ১৯৫৯ শরিয়তপুর জেলার সুরেশ্বর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১১ জানুয়ারি ১৯৭৯ বাংলাদেশ ব্যাংকে যোগদান করেন। চাকরিজীবনের শুরু থেকে তিনি ব্যাংকের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কল্যাণমূলক কাজে নিয়োজিত ছিলেন। তিনি বঙ্গবন্ধু পরিষদ, বাংলাদেশ ব্যাংক শাখার সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, দুই কন্যাসহ অনেক শুভাকাঙ্ক্ষী রেখে গেছেন।

মোঃ বাচ্চু মিয়া
সাবেক সিনিয়র কেয়ারটেকার

বাংলাদেশ ব্যাংক প্রধান কার্যালয়ের সিনিয়র কেয়ারটেকার মোঃ বাচ্চু মিয়া ১৫ মে ২০১৩ এক সড়ক দুর্ঘটনায় ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি........রাজিউন)। তিনি একাউন্টস এন্ড বাজেটিং ডিপার্টমেন্টে কর্মরত ছিলেন। বাচ্চু মিয়া ১৯৬২ সালের ৬ জানুয়ারি গাজীপুর জেলার সোমগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ৭ জুলাই ১৯৮৩ বাংলাদেশ ব্যাংকে যোগদান করেন। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, দুই ছেলেমেয়ে সহ অনেক শুভাকাঙ্ক্ষী রেখে গেছেন।

সাবেক গভর্নর লুৎফর রহমান সরকার স্মরণে

মোঃ আবুল কাসেম
ডেপুটি গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক

লুৎফর রহমান সরকার ১৯৯৬ সালে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর হিসেবে যোগদান করেন। তিনি ছিলেন একজন সাহসী ব্যাংকার। প্রবীণ এই ব্যাংকারকে হারিয়ে ব্যাংকিং জগতে একটি বড় শূন্যতা সৃষ্টি হয়েছে। তিনি প্রায়ই বলতেন স্বাধীনতার পর ব্যাংকের মালিক এবং ব্যাংকারদের উন্নতি ঘটলেও সাধারণ গ্রাহকের কোন প্রকার সুবিধা বাড়েনি। বিষয়টিকে উপলব্ধি করতেন বলেই তিনি গণমানুষের ব্যাংকিং এর প্রচলন করতে চেয়েছিলেন এবং পেরেছিলেন।
লুৎফর রহমান সরকার পঞ্চাশের দশকের মধ্যভাগে করাচির হাবিব ব্যাংক লিমিটেড এ প্রবেশনারি অফিসার হিসেবে যোগ দেন। ১৯৬৫ সালে স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংকে উচ্চ নির্বাহী পদে নিয়োগ পান। ১৯৭২ সালে রাষ্ট্রায়ত্ত রূপালী ব্যাংকের ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার নিযুক্ত হন। ১৯৭৬ সালে জেনারেল ম্যানেজার হিসেবে পদোন্নতি পেয়ে অগ্রণী ব্যাংকে যোগদানের মাধ্যমে তাঁর ক্ষমতা ও কর্মক্ষেত্রের পরিধি বিস্তৃত হয়। তাঁর প্রবর্তিত প্রকল্পগুলোর

সাবেক গভর্নর লুৎফর রহমান সরকার এর সাথে এক অনুষ্ঠানে ডেপুটি গভর্নর মোঃ আবুল কাসেম

মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় হয়েছিল 'বিকল্প প্রকল্প'। এই প্রকল্পের আওতায় অনেক ডেন্টাল ক্লিনিক, ডাক্তারদের চেম্বার, ক্ষুদ্র ব্যবসা স্থাপিত হয়েছিল। অনেক বাস রাস্তায় নেমেছিল। ছাত্রদের মালিকানায় ট্যাক্সিক্যাবও চালু হয়েছিল। গণমানুষের ব্যাংকার সুধীমহলে সমাদৃত হয়েছিলেন।
বাংলাদেশ ব্যাংকে যোগদানের পর অর্থঋণ আদালত গঠন তাঁর একটি সাহসী পদক্ষেপ। অত্যন্ত দক্ষতা ও বিচক্ষণতার সাথে তিনি বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নরের দায়িত্ব পালন করেন। তিনি বাংলাদেশ ব্যাংকের ত্রিশতলা ভবনের উদ্বোধন করেন। বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের পদোন্নতির অচলাবস্থা দূর করে ব্যাপক পদোন্নতি প্রদান করেন। বর্তমান গভর্নর ড. আতিউর রহমানকে তিনি বিশেষভাবে পছন্দ করতেন এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের দু'একটি কাজের সাথে তাকে সম্পৃক্ত করেছিলেন। *(১৭ পৃষ্ঠায় দেখুন)*

টাকা জাদুঘরে সৌজন্য উপহার হিসেবে প্রাচীন মুদ্রা প্রদান

বাংলাদেশ ব্যাংকের কারেন্সী মিউজিয়ামকে বৃহৎ পরিসরে এবং পূর্ণাঙ্গ একটি টাকা জাদুঘরে রূপান্তরের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক ট্রেনিং একাডেমীতে 'টাকা জাদুঘর' স্থাপনের কাজ চলছে। টাকা জাদুঘরকে আধুনিক, প্রযুক্তি নির্ভর, সমৃদ্ধশালী, দৃষ্টিনন্দন এবং তথ্যসমৃদ্ধ করার লক্ষ্যে সেখানে প্রযুক্তিগত সুবিধাদি স্থাপনের পাশাপাশি প্রাচীন মুদ্রা সংগ্রহ করা দিয়ে টাকা জাদুঘরের সংগ্রহকে আরও সমৃদ্ধশালী করার মানসে ব্যক্তি উদ্যোগে সংগৃহীত বিভিন্ন সময়ের ১০০টি প্রাচীন মুদ্রা গভর্নর ড. আতিউর রহমানের হাতে তুলে দেন। গভর্নর মুদ্রাগুলো সাদরে গ্রহণপূর্বক মোঃ আবুল কাশেমকে ধন্যবাদ জানান। এ উপহারের স্বীকৃতিস্বরূপ টাকা জাদুঘরে দানকৃত মুদ্রার পাশে তার নাম লিখিত থাকবে বলেও গভর্নর ড. আতিউর রহমান উল্লেখ

প্রাচীন মুদ্রা সংগ্রাহক মোঃ আবুল কাশেম (সর্ব ডানে) টাকা জাদুঘরের জন্য উল্লেখযোগ্য সংখ্যক প্রাচীন মুদ্রা গভর্নর ড. আতিউর রহমানকে প্রদান করেন

হচ্ছে। ইতোমধ্যে মুদ্রা জাদুঘরের জন্য সুলতানী আমল থেকে শুরু করে বৃটিশ শাসনামল পর্যন্ত বেশ কিছু মুদ্রা ক্রয় করা হয়েছে এবং সমাজের বিভিন্ন পর্যায়ের মানুষ আগ্রহী হয়ে বিভিন্ন সময়ের মুদ্রা ও কাগুজে নোট জাদুঘরে উপহার হিসেবে প্রদান করেছেন। সম্প্রতি নিউমিসমেটিক কালেক্টরস সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক মোঃ আবুল কাশেম বাংলাদেশ ব্যাংকের আহ্বানে সাড়া করেন। ভবিষ্যতেও যেসকল ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান প্রাচীন আমলের মুদ্রা টাকা জাদুঘরে উপহার হিসেবে প্রদান করবেন তাদের সে উপহার সাদরে গ্রহণপূর্বক উপহারদাতাকে যথাযথ স্বীকৃতি দেয়া হবে বলেও গভর্নর জানান। এর আগে ১৬ মে ২০১৩ তারিখে ইঞ্জিনিয়ার নুরুল ইসলাম টাকা জাদুঘরের জন্য বিভিন্ন সময়ের ২৬টি মুদ্রা গভর্নর ড. আতিউর রহমানের হাতে তুলে দেন।

চলতি অর্থবছরে মূল্যস্ফীতি কমেছে

চলতি অর্থবছরের ১১ মাসে মূল্যস্ফীতির হার উল্লেখযোগ্য হারে নেমে এসেছে। জুন ২০১২ থেকে মে ২০১৩ পর্যন্ত সময়ে গড় মূল্যস্ফীতি হয়েছে ৬ দশমিক ৫৭ শতাংশ। ২০১১-১২ অর্থবছরের একই সময়ে এই হার ৯ দশমিক ১৫ শতাংশ ছিল। ৬ জুন ২০১৩ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো মূল্যস্ফীতির এ হালনাগাদ তথ্য প্রকাশ করেছে।

২০১৩-১৪ অর্থবছরের বাজেট উপস্থাপন

জাতীয় সংসদে ৬ জুন ২০১৩ তারিখে ২০১৩-১৪ অর্থবছরের বাজেট উপস্থাপন করা হয়েছে। প্রস্তাবিত এ বাজেটের পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়েছে ২ লাখ ২২ হাজার ৪৯১ কোটি টাকা। এই বাজেটে প্রবৃদ্ধি ধরা হয়েছে ৭ দশমিক ২ শতাংশ এবং মূল্যস্ফীতি প্রাক্কলন করা হয়েছে সাড়ে ৭ শতাংশ। উন্নয়ন বাজেট ধরা হয়েছে ৬৭ হাজার ৩২৭ কোটি টাকা। বাজেটে সামগ্রিক ঘাটতি ধরা হয়েছে ৫৫ হাজার ৩২ কোটি টাকা। ঘাটতি মেটাতে সরকারকে দেশের অভ্যন্তরীণ খাত থেকে ঋণ নিতে হবে ৩৩ হাজার ৯৬৪ কোটি টাকা। এর মধ্যে ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে ঋণের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে ২৫ হাজার ৯৯৩ কোটি টাকা। প্রস্তাবিত বাজেটে উল্লেখযোগ্য বরাদ্দপ্রাপ্ত খাতগুলোর মধ্যে রয়েছে পরিবহন ও যোগাযোগ খাত, শিল্প ও অর্থনৈতিক সার্ভিস খাত, কৃষিখাত, বিদ্যুৎ ও জ্বালানী খাত, শিক্ষা ও প্রযুক্তি খাত।

বগুড়ায় অফিসার্স এসোসিয়েশনের নির্বাচন অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ ব্যাংক অফিসার্স এসোসিয়েশন, ক্যাশ বিভাগ, বগুড়ার বার্ষিক সাধারণ নির্বাচন ২৭ ফেব্রুয়ারি, ২০১৩ অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচিত প্রতিনিধিরা হলেন - মোঃ ইমান আলী,

অফিসার্স এসোসিয়েশনের সদস্যবৃন্দ

সভাপতি; মোঃ চাঁন আলী মিঞা, সহ সভাপতি; মোঃ আব্দুল কুদ্দুস, সাধারণ সম্পাদক; স্বপন কুমার হালদার, সহ সাধারণ সম্পাদক; মোঃ আফজাল হোসেন, কোষাধ্যক্ষ। এছাড়াও সদস্য পদে নির্বাচিত হয়েছেন মোঃ নূরে আলম, আব্দু আলা মোঃ নূরনবী ও মোঃ শাহজালাল।

পরবর্তী প্রজন্মের জন্য মুদ্রা সংরক্ষণ করা প্রয়োজন

- গভর্নর

বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আতিউর রহমান বলেছেন, অর্থনৈতিক ক্রমবিকাশের ধারাকে যুগ থেকে যুগান্তরে লালন করতে যে কাজটি প্রথমেই প্রয়োজন, তা হচ্ছে মুদ্রা বা টাকার যথাযথ সংরক্ষণ। মুদ্রার ঐতিহাসিক গুরুত্ব অপরিসীম। তাই পরবর্তী প্রজন্মের সাথে আমাদের অস্তিত্ব, কৃষ্টি, উদ্ভাবনী শক্তি, সমাজব্যবস্থার যোগসূত্র স্থাপনের জন্য প্রাচীনকালের মুদ্রাসহ সব নোট সংরক্ষণ করা একান্ত প্রয়োজন।

১৮ জুন ২০১৩ বাংলাদেশ ব্যাংক ট্রেনিং একাডেমীতে অনুষ্ঠিত 'আবহমান বাংলার প্রাচীন মুদ্রা: বিকাশ, গুরুত্ব ও সংরক্ষণ' শীর্ষক সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে গভর্নর ড. আতিউর রহমান এ কথা বলেন। বাংলাদেশ ব্যাংকের টাকা জাদুঘরের প্রচার, প্রসার এবং প্রাচীন মুদ্রার বিকাশ ও গুরুত্বকে তুলে ধরার লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের পক্ষ থেকে এ সেমিনারের আয়োজন করা হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন শিল্পী হাশেম খান এবং সম্মানিত অতিথি ছিলেন ইতিহাসবিদ অধ্যাপক মুনতাসির মামুন।

সেমিনারে মূল বক্তব্য উপস্থাপন করেন কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক এবং প্রাচীন বাংলার মুদ্রা বিশেষজ্ঞ ড. সুস্মিতা বসু মজুমদার। তিনি মুদ্রার বিকাশ, ইতিহাস এবং সংরক্ষণের জন্য টাকা জাদুঘরের গুরুত্বের কথা তুলে ধরেন এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের এই উদ্যোগকে স্বাগত জানান। গভর্নর ড. আতিউর রহমান বলেন, মুদ্রার আধুনিক সূতিকাগার হলো কেন্দ্রীয় ব্যাংক। তাই দেশ এবং বিদেশের কোন নাগরিক নির্দিষ্ট কোন মুদ্রা সম্পর্কে জানতে আগ্রহী হলে প্রথমেই কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কাছে আসতে হবে। ব্যাংকের ওপরও অর্পিত রয়েছে মুদ্রা সংরক্ষণ ও প্রদর্শনের গুরুদায়িত্ব। তাই আমাদেরও উচিত মুদ্রার যথাযথ সংরক্ষণ ও প্রদর্শনের ব্যবস্থা রাখা। এই দায়িত্ববোধ থেকেই বাংলাদেশ ব্যাংক একটি পূর্ণাঙ্গ এবং সম্পূর্ণ ডিজিটাল টাকা জাদুঘর প্রতিষ্ঠার কাজ শুরু করেছে।

এ অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ ব্যাংকের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা ছাড়াও অন্যান্য অতিথি উপস্থিত ছিলেন।

ড. আতিউর রহমান সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন

বাংলাদেশ ব্যাংক
কর্মচারী সমবায় ঋণদান সমিতির

ছাত্রবৃত্তি প্রদান অনুষ্ঠান

বাংলাদেশ ব্যাংক কর্মচারী সমবায় ঋণদান সমিতি লিঃ, ঢাকা এর আলাউদ্দিন ছাত্রবৃত্তি প্রদান অনুষ্ঠান ৩ জুন ২০১৩ অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান কার্যালয়ের ব্যাংকিং হলে এ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আতিউর রহমান।

সমিতির চেয়ারম্যান মোহাম্মদ আহমদ আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডেপুটি গভর্নর নাজনীন সুলতানা। এ ছাড়া নির্বাহী পরিচালক ম. মাহফুজুর রহমান, শুভঙ্কর সাহা, সুধীর চন্দ্র দাস, মহাব্যবস্থাপক ড. আবুল কালাম আজাদসহ ব্যাংকের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ, বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রী এবং তাদের অভিভাবকেরা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের অভিনন্দন জানিয়ে গভর্নর ড. আতিউর রহমান বলেন, এটি বাংলাদেশ ব্যাংকের নিজস্ব সিএসআর প্রোগ্রাম। শুধু অন্যদের নির্দেশ প্রদান নয়, বাংলাদেশ ব্যাংক নিজেও সিএসআর কার্যক্রম পরিচালনা করে। তিনি সাভার ট্র্যাজেডির হতভাগ্য মানুষের সহায়তায় বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্মকর্তারা একদিনের বেতন প্রদান করায় তাদের ধন্যবাদ জানান।

উল্লেখ্য সমিতির সদস্যদের সন্তান যারা ২০১১ ও ২০১২ সালে অনুষ্ঠিত প্রাথমিক ও জুনিয়র বৃত্তি, এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষায় কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হয়েছে তাদেরকে এ অনুষ্ঠানে গভর্নর ড. আতিউর রহমান ও ডেপুটি গভর্নর নাজনীন সুলতানা বৃত্তির চেক প্রদান করেন।

ড. আতিউর রহমান একজন শিক্ষার্থীকে বৃত্তি প্রদান করছেন। পাশে ডেপুটি গভর্নর নাজনীন সুলতানা

বাংলাদেশ ব্যাংককে আমরা তথ্য প্রযুক্তিনির্ভর মানবিক কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিসেবে দেখতে চাই

সুধীর চন্দ্র দাস
নির্বাহী পরিচালক, বাংলাদেশ ব্যাংক

বাংলাদেশ ব্যাংকের একাউন্টস এন্ড বাজেটিং, স্পেশাল স্টাডিজ, ডেট ম্যানেজমেন্ট এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত নানা বিষয়ে নির্বাহী পরিচালক সুধীর চন্দ্র দাস অগ্রণী ভূমিকা পালন করছেন। তাঁর দীর্ঘদিনের চাকরির অভিজ্ঞতার আলোকে এসব বিষয়ে তাঁর সাথে সাক্ষাৎকারের বিশেষ অংশগুলো তুলে ধরা হলো–

বাংলাদেশে আর্থিক খাতের প্রসার ও পরিবর্তনের সাথে সাথে দেশে যে প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়ন সাধিত হচ্ছে এতে বাংলাদেশ ব্যাংক কী ভূমিকা রাখতে পেরেছে ?

দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংকের মুখ্য দায়িত্ব হলো মূল্য স্থিতিশীলতা বজায় রাখা, আর্থিক খাত নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধান এবং সর্বোপরি আর্থিক খাতের স্থিতিশীলতা বজায় রাখার পাশাপাশি জাতীয় স্বার্থে উৎপাদনশীল সম্পদের যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়ন নিশ্চিত করা।

আর্থিক খাতের প্রসার ও ইতিবাচক পরিবর্তনের ফলে তাত্ত্বিকভাবে দেশে অর্থ প্রবাহ বৃদ্ধি পায় এবং মানুষের উৎপাদনমুখী কর্মকাণ্ড বৃদ্ধি পায়। ফলে দেশের জিডিপির প্রবৃদ্ধি ঘটে; যার উল্লেখযোগ্য প্রভাব পড়ে ক্রমবর্ধমান হারে দারিদ্র্য বিমোচন ও টেকসই উন্নয়নের ওপর। দেশের প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়নে বাংলাদেশ ব্যাংকের ভূমিকা অনস্বীকার্য। বাংলাদেশ ব্যাংক তার নিজস্ব নিয়মনীতির মাধ্যমে একদিকে যেমন বেসরকারি খাতে ঋণ প্রবাহ সঠিক মাত্রায় রাখে অন্যদিকে সরকারকে তার ঘাটতি বাজেট পূরণে ব্যাংকিং খাত থেকে অর্থের যোগান দিয়ে থাকে। সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক ও অবকাঠামোগত কর্মকাণ্ডে যে অর্থের প্রয়োজন হয় তা অনেক ক্ষেত্রেই রাজস্ব আয় দিয়ে মেটানো সম্ভব হয় না। এ সকল কর্মকাণ্ডে পর্যাপ্ত বিনিয়োগের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক সরকারকে ট্রেজারি বিল ও বন্ড ইস্যুর মাধ্যমে ব্যাংকিং খাত থেকে অর্থের যোগান দিয়ে থাকে। ফলে, দেশের প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়ন কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় অর্জন বাংলাদেশ ব্যাংক নিশ্চিত করছে।

বিদেশি বিনিয়োগ আকৃষ্ট করার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংক কী ভূমিকা পালন করছে ?

একটি দেশে বিদেশি বিনিয়োগের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টিতে তিনটি উপাদান মুখ্য ভূমিকা রাখে: ১. অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ২. স্বচ্ছ এবং স্থিতিশীল আইন কাঠামো ৩. ব্যবসা-বাণিজ্য বান্ধব পরিবেশ। এই তিনটি উপাদানেই বাংলাদেশ ব্যাংকের ভূমিকা রয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক প্রণীত মুদ্রানীতি এবং এর সঠিক বাস্তবায়ন প্রশংসিত হয়েছে এবং বৈদেশিক মুদ্রা বিনিয়োগ নীতিমালা সহজ, উদারীকরণ ও বিনিয়োগ বান্ধব করার ক্ষেত্রে প্রভুত উন্নতি সাধিত হয়েছে।

বাংলাদেশের অর্থনীতি এবং জাতীয় পর্যায়ে বাংলাদেশ ব্যাংক ব্যাপক ভূমিকা পালন করে আসছে। ব্যাংকের সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য কী কী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে ?

কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্মকাণ্ড সরকার তথা দেশের সার্বিক উন্নয়নে যথেষ্ট গুরুত্ববহ হওয়ায় এর অবকাঠামো ও অন্যান্য অভ্যন্তরীণ বিষয়ে নিরাপত্তা ব্যবস্থা সুসংহত হওয়া প্রয়োজন। বাংলাদেশ ব্যাংকের সার্বিক নিরাপত্তা সুসংহতকরণে সরকার কর্তৃক ইতোমধ্যে প্রতিষ্ঠানটিকে প্রথম শ্রেণির KPI-ভুক্ত হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এ প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ ব্যাংকের কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদারকরণে আধুনিক প্রযুক্তি ও যন্ত্রপাতি স্থাপনসহ বেশকিছু ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংক আধুনিকায়নে গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রমের ধারাবাহিকতায় এর নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণে এবং কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিসেবে সেবার মান বৃদ্ধিকল্পে সম্প্রতি ব্যাংকের অফিস ভবনসমূহের প্রবেশদ্বারে ‘ডিজিটাল অ্যাক্সেস কন্ট্রোল সিস্টেম (DACS)’ স্থাপন করা হয়েছে। উক্ত সিস্টেম এর আওতায় বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রয়োজনীয় অ্যাক্সেস কার্ড প্রদান এবং বিভিন্ন শ্রেণি ও পেশার অতিথি এবং অভ্যাগতদের আগমন ও বহির্গমন নিয়ন্ত্রণ/মনিটরিং-এর উদ্দেশ্যে একটি নীতিমালাও প্রণয়ন করা হয়েছে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের একাউন্টস এন্ড বাজেটিং কার্যক্রম সম্পর্কে কিছু বলুন। বাংলাদেশ ব্যাংকের কার্যক্রম সুষ্ঠুরূপে নিষ্পন্ন করার জন্য এর গুরুত্ব কতটুকু ?

একাউন্টস এন্ড বাজেটিং ডিপার্টমেন্ট মূলত বাংলাদেশ ব্যাংকের বাজেট প্রণয়ন, বাংলাদেশ সরকারের হিসাব সংরক্ষণ ও আর্থিক প্রতিবেদন প্রস্তুতের যাবতীয় কার্যক্রম সম্পন্ন করে থাকে। বিগত বছরগুলোতে এ কার্যক্রম সনাতন পদ্ধতিতে সম্পন্ন করা হতো। এতে ক্ষেত্র বিশেষে যথাসময়ে প্রতিবেদন উপস্থাপন সম্ভবপর হতো না। বর্তমানে একাউন্টস এন্ড বাজেটিং ডিপার্টমেন্ট এর কাজ ERP (Enterprise Resource Planning) এর SAP & CBS (Core Banking Solutions) Package এর মাধ্যমে সম্পন্ন করা হচ্ছে। ফলে সকল প্রকার আর্থিক প্রতিবেদন যথাসময়ে উপস্থাপন করা সম্ভব হচ্ছে। তা ছাড়া আন্তর্জাতিক হিসাব মান নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে আর্থিক বিবরণীসমূহ (Financial Statements) IFRS/IAS অনুযায়ী প্রস্তুত করা হচ্ছে। আন্তর্জাতিকমানের নিরীক্ষা প্রতিষ্ঠান দ্বারা বাংলাদেশ ব্যাংকের আর্থিক প্রতিবেদন নিরীক্ষা করা হচ্ছে।

স্পেশাল স্টাডিজ সেল বর্তমানে কি কার্যক্রম গ্রহণ করছে ?

স্পেশাল স্টাডিজ সেল সম্প্রতি বাংলাদেশ ব্যাংকের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কমপ্রিহেনসিভ রুলস অব বিজনেস প্রণয়নের কাজে নিয়োজিত রয়েছে যা বাস্তবায়িত হলে ইতিপূর্বে প্রণীত সার্ভিস স্ট্যান্ডার্ড এর জায়গায় এটা প্রতিস্থাপিত হবে। এ ছাড়াও বিডি ম্যানুয়াল নতুন করে প্রণয়নের উদ্যোগও একই সঙ্গে এগিয়ে চলেছে।

সাম্প্রতিককালে আলোচিত বদলে যাওয়া বাংলাদেশ ব্যাংক সম্বন্ধে কিছু বলুন।

সাম্প্রতিক কালের বদলে যাওয়া বাংলাদেশ ব্যাংক সম্পর্কে যদি কিছু বলতে হয় তা হলে আমি প্রথমেই বলবো একটি ট্রাডিশনাল কেন্দ্রীয়

ব্যাংক থেকে ডিজিটাইজড কেন্দ্রীয় ব্যাংকে রূপান্তরই এই বদলে যাওয়া কেন্দ্রীয় ব্যাংক। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রায় প্রতিটি কর্মকাণ্ডেই এই তথ্য প্রযুক্তির হাওয়া লেগেছে যা দেশের সমগ্র ব্যাংক ব্যবস্থাকে প্রযুক্তি নির্ভর ব্যাংকিং ব্যবস্থা প্রবর্তনে বাধ্য করছে। মোবাইল ব্যাংকিং ব্যবস্থা দ্রুত প্রসার লাভ করছে যার মাধ্যমে কোটি কোটি মোবাইল ফোন গ্রাহক ব্যাংকিং ব্যবস্থার আওতায় চলে আসছে। ই-রিক্রুটমেন্ট, ই-টেন্ডারিং, ইলেকট্রনিক ড্যাশবোর্ড, অটোমেটেড ক্লিয়ারিং হাউজ, ইলেকট্রনিক ফান্ড ট্রান্সফার, অন-লাইন সিআইবিসহ অসংখ্য সফট্ওয়্যার চালু করা হয়েছে এবং তা অত্যন্ত সফলভাবে কাজ করছে যা ডিজিটাল বাংলাদেশ এর স্বপ্ন বাস্তবায়নে সমগ্র দেশের জন্য উদাহরণ ও পথিকৃৎ হয়ে আছে। যে সকল বিষয়ে বাংলাদেশ বিশেষ প্রশংসার দাবিদার তার মধ্যে রয়েছে ব্যাংকিং ব্যবস্থা ডিজিটাইজেশন। ব্যাংকিং ব্যবস্থায় গতিশীলতা আনয়ন ও সময়োপযোগী করতে অটোমেটেড ক্লিয়ারিং হাউজ, ইলেক্ট্রনিক ফান্ড ট্রান্সফার সিস্টেম, অন-লাইন ব্যাংকিং, ন্যাশনাল পেমেন্ট স্যুইচ স্থাপন, সিআইবি অন লাইন, সরকারি সিকিউরিটিজের অকশনে অন লাইনে বিড দাখিল ব্যবস্থা চালু এবং সেকেন্ডারি মার্কেটে সরকারি সিকিউরিটিজ ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য বিশেষ প্লাটফর্ম (TWS) স্থাপন করা হয়েছে। ব্যাংকিং কার্যক্রমে অনিয়ম ও জালিয়াতিমূলক অপতৎপরতার সম্ভাব্য প্রবণতা চিহ্নিত করার জন্য অনলাইন ইলেকট্রনিক সুপারভিশন

অফিসে কর্মরত নির্বাহী পরিচালক সুধীর চন্দ্র দাস

ড্যাশবোর্ড চালু এবং মানি লন্ডারিং ও আন্তর্জাতিক সন্ত্রাস প্রতিরোধ কার্যক্রমকে ত্বরান্বিত করতে সম্প্রতি goAML সফটওয়্যার গ্রহণ করা হয়েছে।

সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশ ব্যাংক তার চিরাচরিত ব্যুরোক্রেটিক খোলস থেকে বেরিয়ে এসেছে এবং জনমুখী মানবিক কর্মকাণ্ডে অধিকতর সক্রিয় হয়েছে। এরই অংশ হিসেবে ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন, বর্গাচাষিদের জন্য ব্যাংকের মাধ্যমে বাস্তবায়িত ৫০০ কোটি টাকার ঋণ প্রকল্প, আর্থিক খাত উন্নয়নে রোড শো এবং বিদেশে রেমিট্যান্স ও বিনিয়োগ মেলা, গ্রাহক স্বার্থ সংরক্ষণ কেন্দ্র (CIPC), কর্পোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতা, গ্রিন ব্যাংকিং ও পরিবেশ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা, স্কুল ব্যাংকিং, কারেন্সী মিউজিয়াম প্রতিষ্ঠাকরণ ও গুণীজন সংবর্ধনাসহ অসংখ্য কার্যক্রম নেয়া হয়েছে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের এ সকল কর্মকাণ্ড ব্যাংককে আরও বেশি জনসম্পৃক্ত করেছে এবং গণমানুষের কাছে ব্যাংকিং কর্মকাণ্ডের সেবা দ্রুত পৌঁছে দেয়ার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছে।

বাংলাদেশ ব্যাংক তার নিজস্ব কর্মকাণ্ডেও তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহারকে এক অনন্য রূপ দান করেছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্মকর্তাগণ তাদের নিজ নিজ কম্পিউটার ব্যবহার করে ইন্ট্রানেট ও ইন্টারনেটের মাধ্যমে দ্রুততার সাথে তথ্য আদান-প্রদানে সক্ষম হচ্ছেন। অতি সম্প্রতি অটোমেটেড লিভ ম্যানেজমেন্ট ও ইনওয়ার্ড/আউটওয়ার্ড চালু হয়েছে যার ফলে বাংলাদেশ ব্যাংক পেপারলেস হবার দিকে আরো কয়েক ধাপ এগিয়ে গিয়েছে।

বৈদেশিক ও অভ্যন্তরীণ উভয় ক্ষেত্রে রেমিটেন্স প্রবাহ আরো দ্রুত, গতিশীল ও প্রাতিষ্ঠানিক করতে মোবাইল ব্যাংকিং সফলভাবে চালু করা হয়েছে। বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের সামাজিক দায়বদ্ধতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে গ্রিন ব্যাংকিংয়ে উৎসাহ প্রদান ও করপোরেট সোশ্যাল রেসপনসিবিলিটি (CSR) কার্যক্রম প্রসারিত করার জন্য গ্রিন ব্যাংকিং ও সিএসআর বিভাগ নামে একটি নতুন বিভাগ কার্যক্রম শুরু করেছে।

বদলে যাওয়া বাংলাদেশ ব্যাংকের অন্যতম আলোচিত দিক হচ্ছে আর্থিক সেবাভুক্তিতে বাংলাদেশ ব্যাংকের অবদান। সরকারের দারিদ্র্য বিমোচনে নানামুখী উদ্যোগে সমর্থন যোগানোর পাশাপাশি দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীকে আর্থিক সেবার আওতায় নিয়ে আসা তথা আর্থিক সেবাভুক্তিকরণ কর্মসূচির ওপর বাংলাদেশ ব্যাংক বিশেষ জোর দেয়ায় বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ এখন বিভিন্ন ব্যাংকিং প্রোডাক্টের মাধ্যমে সমাজের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীকে ব্যাংকিং সেবার আওতায় নিয়ে আসছে।

বাংলাদেশ ব্যাংককে একটি বিশ্বমানের কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা ও আর্থিক খাতের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় ব্যাংক কর্মকর্তাদের সক্ষমতা ও দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় ব্যাংকে কৌশলগত পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। কর্মপরিবেশ উন্নত করা (সম্প্রতি কর্মস্থলে আধুনিক কিউবিক্যাল প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে), সার্বক্ষণিক ইন্টারনেট সুবিধা এবং দেশে বিদেশে উচ্চ শিক্ষা ও উন্নত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ব্যাংক কর্মকর্তাদের মধ্যে ইতিবাচক পরিবর্তন আনা সম্ভবপর হচ্ছে।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকে আপনার দীর্ঘদিনের চাকরির অভিজ্ঞতার আলোকে বাংলাদেশ ব্যাংক এর ভবিষ্যত কর্মকাণ্ড সম্পর্কে কিছু বলুন।

আমরা বাংলাদেশ ব্যাংকের সরাসরি নিয়োগপ্রাপ্ত ২য় ব্যাচের কর্মকর্তা হিসেবে ইতোমধ্যে চাকরি জীবনের ৩২ বছর অতিক্রম করেছি। এই সুদীর্ঘ কর্মজীবনে আমার কাছে মনে হয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক দেশের অনন্য সাধারণ একটি প্রতিষ্ঠান যার তুলনা শুধু নিজেই। শতভাগ পেশাজীবী একটি প্রতিষ্ঠান এই কেন্দ্রীয় ব্যাংক। কেন্দ্রীয় ব্যাংক দেশকে অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা এবং অগ্রগতিতে দল মতের উর্ধ্বে থেকে শুধুমাত্র প্রফেশনাল উৎকর্ষতার মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক সেবা দিয়ে থাকে তথা দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

বৈশ্বিক পরিবর্তনের সাথে খাপ খাইয়ে চলার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক একটি কৌশলগত পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে যার আলোকেই মূলত বর্তমান কর্মকাণ্ড পরিচালিত হচ্ছে। ভবিষ্যতেও বাংলাদেশ ব্যাংক তার লক্ষ্য সফলভাবে অর্জনে আরো সচেষ্ট থাকবে বলে আমরা মনে করি। এটা অনস্বীকার্য যে, অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের মতো বাংলাদেশ ব্যাংকেরও নিজস্ব কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে। এসকল সীমাবদ্ধতা কাটিয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক তার লক্ষ্য অর্জনে অবশ্যই কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাবে বলে আমরা বিশ্বাস করি।

বাংলাদেশ ব্যাংককে আপনি কী ধরনের কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিসেবে দেখতে চান ?

বাংলাদেশ ব্যাংককে আমরা তথ্য প্রযুক্তিনির্ভর মানবিক কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিসেবে দেখতে চাই। বাংলাদেশ ব্যাংককে একটি সর্বদা পরিবর্তনশীল প্রতিষ্ঠান হিসেবেও দেখতে চাই। তথ্য প্রযুক্তির ওপর ভিত্তি করে বাংলাদেশ ব্যাংক এমন একটি ব্যাংকিং ব্যবস্থা গড়ে তুলবে যা হবে সম্পূর্ণ ডিজিটাইজড। ব্যাংকিং ব্যবস্থার অভিভাবক হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংক প্রকৃত অর্থেই একটি ফরোয়ার্ড লুকিং, প্রোঅ্যাক্টিভ কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিসেবে আবির্ভূত হবে যার ফলে ব্যাংকিং ব্যবস্থা হবে সম্পূর্ণ নিরাপদ, সময়োপযোগী এবং পরিবেশ বান্ধব।

সাক্ষাৎকার গ্রহণে: সাঈদা খানম
উপ মহাব্যবস্থাপক, ডিসিপি

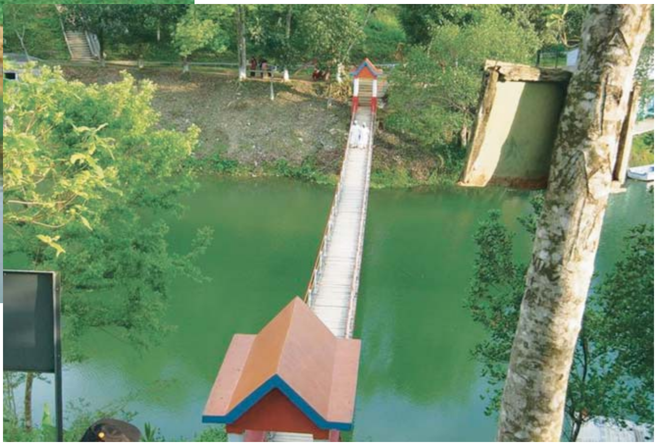

পর্যটন কেন্দ্র

শিহরণ জাগানো দুঃসাহসিক যাত্রা

বান্দরবান ভ্রমণ

মোঃ রফিকুর রহমান

'আকাশে হেলান দিয়ে পাহাড় ঘুমায় ঐ'– কাজী নজরুল ইসলামের গানের চিত্রকল্পটির বাস্তব চিত্রায়ন বাংলাদেশের পার্বত্য জেলা বান্দরবান। প্রথমবার (২০১০ সালে) প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের অপরূপ লীলাভূমি বান্দরবান ভ্রমণের অনুভূতি প্রাণে মনে অন্তরে জড়িয়ে ছিল নিবিড়ভাবে, আর সে অনুভূতি মাঝে মাঝে শেয়ার করতাম পরিবারের লোকজনের সাথে, কখনো বন্ধুদের সাথে। এবার স্বজন বন্ধুরা সপরিবারে ঢাকার বাইরে কোথাও ঘুরে আসার প্রস্তাবে প্রথম পছন্দ হিসেবে বান্দরবানকে বেছে নিল। আমার অর্জিত অনুভূতিগুলো আপনজনদের সাথে ভাগ করার সুযোগ পেয়ে ঘরে কারো সাথে আলাপ না করেই রাজী হয়ে গেলাম।

৫ ফেব্রুয়ারি, ২০১৩
রাত সাড়ে ন'টায়
মতিঝিল থেকে বাসযোগে বান্দরবানের উদ্দেশে যাত্রা শুরু। ২৬ জনের দলের সদস্য তিন বছরের শিশু থেকে চাকরি হতে সদ্য অবসরে যাওয়া ব্যক্তিও ছিল, ছিল নিখাদ গৃহিণী, স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের শিক্ষার্থী। সবাই আমরা ভিন্ন ভিন্ন পরিবারের স্বজন।

বান্দরবান অভিযানের শিহরণের অনুভূতি নিয়ে, আধো ঘুম আধো জাগরণের মধ্য দিয়ে সমতল পাহাড় গ্রাম নগর পেরোতে পেরোতে রাত যখন ভোরের সীমানার কাছাকাছি আমাদের গাড়ি পৌঁছে যায় মেঘলার দুয়ারে (পূর্ব থেকে নির্ধারিত পর্যটন কটেজ, বান্দরবান শহরের প্রবেশমুখে, শহর থেকে ৪ কিঃ মিঃ)। সবাই খুব আনন্দ নিয়ে হইচই করে বাস থেকে নামলাম, বিদায়ী শীতের রাতের কনকনে শীতল বাতাস গায়ে কাঁপন ধরিয়ে দেয়, এর মধ্যে ছোট শিশুটিও আনন্দ করছে, সবাইকে আনন্দ দিচ্ছে- এ এক অপরূপ অভিজ্ঞতা। শেষ রাতের নৈশব্দ আর নির্জনতার অজানা অচেনা পাহাড়ি এলাকায় সবাই মিলে গলা ছেড়ে গান গেয়ে মানসিক সাহস ধারণ করে কটেজের লোহার দরজায় করাঘাত করতে থাকি। প্রায় মিনিট পনের পরে ভেতর থেকে একজন এসে পরিচয় জেনে দরজা খুলে দেয়। বাক্সপেটরা নিয়ে প্রবেশ করি রেস্ট হাউসের অভ্যর্থনা কক্ষে। তারও প্রায় মিনিট বিশেক পর ফজরের আজান শোনা যায়, নামাজের জন্য সবাই (যারা মসজিদে যান) রেস্ট হাউস হতে বের হয়ে মসজিদের উদ্দেশে অজানা অচেনা অন্ধকার পথ ধরি। পাহাড়ের ওপরে ছোট একটা মসজিদ, পাশে ঢাল বেয়ে অনেকটা নামলেই স্বচ্ছ জলাধার।

বাঙালি ছাড়াও ১১টি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সমন্বিত এলাকা বান্দরবান। দেখে মনে হলো পরম সৌহার্দ্য আর সম্প্রীতির বহুজাতিক মিলনভূমি। পথের মোড়ে মোড়ে সকল মানুষের শান্তিময় জীবনযাপন আর সহাবস্থানের বিলবোর্ড স্থাপন করেছে বান্দরবান সেনা রিজিয়ন।

প্রথম দিন সকালের অভিযানস্থল কটেজের খুব কাছেই মেঘলা পর্যটন কেন্দ্র, প্রাকৃতিক সৌন্দর্যকে সামান্য কৃত্রিমতার মিশেল দিয়ে একটি উদ্যান তৈরি হয়েছে। দর্শনীর বিনিময়ে প্রবেশ করে খাড়া উঁচু উঁচু পাহাড়ের ফাঁকে ফাঁকে স্বচ্ছ জলাধার, তার ওপর ঝুলন্ত সেতু, আছে কেবল কারও। সবাই মিলে ঘুরে বেড়ালাম দুপুর

স্বর্ণমন্দির

অব্দি। পরের সফর শহর পেরিয়ে উত্তরে বালাঘাট পালপাড়া নামক স্থানে (পর্যটন কেন্দ্র হতে প্রায় ৮ কিঃ মিঃ দূরে) স্বর্ণ মন্দিরে। সমতল থেকে ২০০ ফুট উঁচু পাহাড়ের চূড়ায় অপূর্ব স্থাপত্য শৈলীর সোনালি রঙের বৌদ্ধ মন্দিরটিতে (স্থানীয় নাম 'বৌদ্ধ ধাতু যাদি') দাঁড়িয়ে পুরো বান্দরবান শহর, দূরে আকাশ পাহাড়ের মাখামাখি সর্বোপরি

চিম্বুক পাহাড়

বগা লেক

শেষ বিকেলের পবিত্রতা উপভোগ করার এক অনিন্দ্য পরিবেশ।

দ্বিতীয় দিনের অভিযান সবার কাঙ্ক্ষিত নীলগিরি, মেঘলা কটেজ থেকে প্রায় ৫০ কিঃ মিঃ দূরত্ব। সকাল ন'টায় কটেজ গেট থেকে 'চান্দের গাড়ি' (খোলা হুডের জীপ) চড়ে উঁচু-নিচু আঁকাবাঁকা

চান্দের গাড়ি

দুর্গম গিরিপথে প্রায় তিন ঘন্টার শিহরণ জাগানো দুঃসাহসিক যাত্রা। নীলগিরি যাত্রাপথের ভাললাগা, উত্তেজনা, শিহরণ অন্তরে ধারণ করা যতটা সহজ ভাষায় প্রকাশ করা আমার জন্য ততটাই সাধ্যাতীত। ডানে- বায়ে, সামনে দূরে-কাছে সুনীল আকাশ কোলে সবুজ পাহাড়ের হাতছানি, মাঝে মাঝে পথের গা ছুঁয়ে গভীর খাদ। এ পথ ধরে ছুটে চলে চান্দের গাড়ি, কখনও সোজা ওপরে উঠে যাচ্ছে, কখনও খাড়া নিম্নগামী, ভয় আর ভাল লাগার এক অপার্থিব অনুভূতি। অবশেষে নীলিগিরি, সমুদ্র সমতল থেকে ৩০০০ ফুট উঁচুতে বিধাতার সৃষ্টি মহিমা উপভোগের জন্য বাংলাদেশ সেনাবাহিনী কিছু নান্দনিক স্থাপনা আর বাগানের সন্নিবেশ ঘটিয়েছে। এ শৈল শিখরে রয়েছে একটি হেলিপ্যাড। পাহাড়ের চূড়ায় এবং ঢালুতে বিভিন্ন

হেলিপ্যাড

ধরনের দৃষ্টিনন্দন কয়েকটি কটেজ রয়েছে রাত্রি যাপনের জন্য। এখানে কটেজগুলোর নামও কাব্যিক, যেমন মেঘদূত, নীলাঙ্গন, আকাশনীলা, গিরিমারমেট ইত্যাদি। সাহস আর অর্থ যোগান নিশ্চিত করা গেলে এখানে রাত যাপনের অপার্থিব সুখভোগের সুযোগ নেয়া যায়। শীতের দুপুরে নির্মেঘ আকাশ আর সবুজ পাহাড়ের মিতালী যেভাবে প্রাণ ভরে উপভোগ করেছি রাতের অভিজ্ঞতা নিশ্চিত আরো আরো বেশি উপভোগ্য হবে, বিশেষ করে যদি কোন ভরা জোছনার রাত হয়। স্বজন বন্ধুদের প্রায় অর্ধশতকের জীবন, আক্ষেপ নেই, দুচোখ সার্থক করে যা দেখলাম। নিজেরা না পেরেছি ভবিষ্যত প্রজন্মের মধুচন্দ্রিমার জন্য বেছে নিলাম প্রিয় নীলগিরি। প্রচণ্ড সুখানুভূতি নিয়ে নীলগিরি পিছনে রেখে ফেরার পথ ধরি।

নীলগিরি যাওয়া আসার পথে আরো দুটি দর্শনীয় স্থান দেখা যেতে পারে। একটি বহুলশ্রুত 'চিম্বুক পাহাড়', অপরটি পাহাড়ি ঝর্ণার ক্ষীণধারা 'শৈল প্রপাত'। আমরা পূর্ব পরিকল্পনামত ফেরার পথে থামলাম চিম্বুক পাহাড়ের পাদদেশে। বান্দরবান শহরে হতে ২৬ কিঃ মিঃ দূরত্বে ২৫০০ ফুট উঁচু চিম্বুক পাহাড় উচ্চতায় বাংলাদেশে তৃতীয়। অনেকেই খাড়া পথ বেয়ে চিম্বুকের চূড়ায় ওঠে। এখানে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর তত্ত্বাবধানে পরিচালিত একটি রিসোর্ট আছে। পাহাড়ের পাদদেশে পথের পাশে একটি হোটেলে পেটপূজো সেরে ছুটে যাই শৈল প্রপাতে। শহর থেকে ৮ কিঃ মিঃ দূরত্বে ঘন ঝোপঝাড় ঘেরা পাহাড়ের মাঝ দিয়ে বয়ে চলা পাহাড়ি ঝর্ণার একটি বহমান ক্ষীণধারা এখানে দৃশ্যমান। আগেরবার যখন এসেছিলাম তখন যে পরিমাণ পানি বহমান দেখেছিলাম এবার সেটা দেখতে না পেয়ে মনটা একটু খারাপই হলো। তবুও যারা প্রথম দেখেছে তাদের ভাল লেগেছে। বর্ষাকালে পানির প্রবাহ থাকে প্রচুর, পানি খুব স্বচ্ছ ও শীতল। এখানে পাহাড়ি রকমারি দ্রব্যাদির ছোটখাট একটা বাজার জমে উঠেছে, আর আমাদের ঢাকাবাসী ক্রেতারাও হুমড়ি খেয়ে পড়ছে। এ পথে আরো একটি দর্শনীয় এলাকা মিলনছড়ি (শহর থেকে ৩ কিঃ মিঃ দূরত্বে), চারদিকে সবুজ ছাওয়া উঁচু পাহাড়ি এলাকাটিতে রয়েছে প্রাকৃতিক পরিবেশের কয়েকটি রিসোর্ট। এখানে পাহাড়ের অতি উচ্চতায় রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে পূর্ব প্রান্তে তাকালে দেখা যায় অবারিত সবুজের খেলা এবং সবুজ প্রকৃতির বুক চিরে সর্পিল গতিতে বয়ে চলা মোহনীয় সাঙ্গু নদী। আমাদের বিকেলবেলার অভিযাত্রা 'নীলাচল' ও শুভ্রনীলা'। বান্দরবান শহর থেকে ৫ কিঃ মিঃ দূরত্বে প্রায় ২০০০ ফুট উচ্চতায় নান্দনিক পর্যটন কেন্দ্রটি বান্দরবান জেলা পরিষদের ব্যবস্থাপনায় গড়ে উঠেছে। পাহাড়ের এমন কাব্যিক নাম কে রেখেছে জানিনা তবে এখানে সূর্য ডোবার ক্ষণে দূরে ও কাছের পাহাড়গুলোর গায়ে সত্যিই একটু নীলাভ পরশ লক্ষ্য করা যায়। সূর্য পাহাড়ের আড়ালে চলে যাবার পর গাঢ় সবুজ যখন কাল আঁধারে আচ্ছাদিত হতে থাকে সে সময়টুকুর অনুভূতি সত্যিই অতুলনীয়। এখানেও বর্ষাকালের সৌন্দর্য অপরূপ, মেঘগুলো খুব কাছে ছুঁয়ে যায়। আবেগ প্রকাশে ভাষার দীনতা ঘোচাতে রবীন্দ্রনাথের আশ্রয় নিই একটু। অন্যভাবেই- কী আঁচল বিছায়েছ আকাশ কোলে পাহাড় ছুঁয়ে ছুঁয়ে।

রাতে ফিরে আসি মেঘলা কটেজে। স্রষ্টার সৃষ্টির অপরূপ রূপ মাধুরী দেখে কৃতজ্ঞতায় নত হতে হয় বার বার। তারপরও বলতে হয়, অনেকেই বলেছে বান্দরবান থেকে প্রায় ৭০ কিঃ মিঃ দূরত্বে সমুদ্রসমতল হতে ৩০০০ ফুট উঁচুতে অবস্থিত ১৫ একর জুড়ে প্রাকৃতিক জলাধার 'বগা লেক' না দেখলে বান্দরবান ভ্রমণ অপূর্ণ থেকে যায়। ছোটবড় সবাই মিলে বগালেক ভ্রমণে কিছুটা ঝুঁকি থাকায় এবার হলো না। এছাড়াও বিজয় তাজিংডং, কেওকারাডং এর মত পর্বতশৃঙ্গগুলো দেখার সুযোগ নিতে পারিনি। ভবিষ্যতে আশা রইল। আশা রইল এরপর বান্দরবান ভ্রমণে পাহাড়ের কোল ছুঁয়ে যাওয়া সাংগু নদীতে বেড়ানোর।

৮ ফেব্রুয়ারি রাতের গাড়িতে ফেরার পথ ধরি আজীবন অভ্যস্ত বাধ্যতামূলক কোলাহলময় অবস্থানে।

লেখক: উপ ব্যবস্থাপক
মতিঝিল অফিস

‘সুন্দর’কে দেখতে চাই নিখাদরূপে ‘ভণ্ডামি’ ছাড়া

তাপসী রানী কুন্ডু

নির্ঘুম রাতের সাথী তুমি- বুকে দীর্ঘশ্বাসের ঝড়
মুহূর্তে উড়িয়ে নাও বসতির চাল।
দিবসের সালোক-সংশ্লেষ তুমি ‘সূর্যহৃদয়’ কে কর স্পর্শ,
তন্দ্রালোকে পদ্মকুঁড়ির আঁখি মেলা রাতের তারায় কর ভিড়।
শ্বাসরুদ্ধ করে হৃদ্‌পিণ্ডে ডুকরে ওঠ কেন-
এত আনন্দের মাঝে দুঃখ বিলাস হয়ে?
ঘুম কেড়ে নাও মধ্যরাতে প্রায়শই।
তবুও, কিছুই বলিনা তোমাকে-
পৃথিবীর কারও কাছে কোন প্রাপ্তি নেই আমার
আছে শুধু দেনা ও দায়বদ্ধতা।
জন্ম-জন্মান্তরের দাসত্ব শৃঙ্খল বেড়ি জন্মভূমির মতন
স্বাধীনভূমে বন্দী নিবাস।
কাকে বলব এ কষ্টের কথা?
সবাই আরও বেশি ক্লেদ ভরা জীবনে করছে বসবাস।
হীনমন্যতায়, স্বার্থপরতায় সহোদরকে গিলছে প্রতিদিন-
রুই-কাতলা, বোয়াল, রাক্ষুসে মাগুর, হাঙ্গর, তিমি!
কেবলই স্বার্থপরতার রূপ-বৈচিত্র্য ছাড়া দেখতে পাইনে অন্যকিছু।
তবু, নিজকে মানিয়ে নিতে পারি না কেন অবলীলায়?
কেন চৈতন্যে রক্তক্ষরণ হয় মধ্যরাতে নির্ঘুম বিছানায়?
প্রত্যাশা দেয় না হৃদয়ে উত্তাপ।
শরীর শীতল হয়, ক্রোধ জন্মাবার শক্তিও হরণ করে
আত্মহননের পিছু ধাওয়া।
তারপরও, নির্ঘুম বিছানায় বুকে ওঠে দীর্ঘশ্বাসের ঝড়
প্রলয় যাচঞা করি কায়মনে।
অতঃপর নবসৃষ্টিতে সুন্দরকে দেখতে চাই
আমি ‘সুন্দর’ কে দেখতে চাই শুধু নিখাদরূপে ‘ভণ্ডামি’ ছাড়া।

মনে পড়ে দিনগুলো

পবিত্র কুমার রায়

সে দিনগুলো আর ফিরে আসবে না এ জীবনে
দশবার মরেও জন্ম হবে না এ ভুবনে।
বাল্য, কৈশোর, যৌবনের কত না দুঃখ কষ্ট যাতনা
হাসি-কান্না আর আনন্দভরা বেদনা
তিক্ত মধুর সুখস্মৃতি
এখনো ফিরে আসে একলা আসরে
ছড়িয়ে নানা রঙের উজ্জ্বল দ্যুতি।
কি হে বন্ধু, তুমি কোথায়
এখন তোমায় খুঁজে সময় বয়ে যায়
শুধুই বৃথায়।
তুমি কিশোর-কিশোরী, তরুণ-তরুণী, প্রেমময়-প্রেমময়ী
আমি খুঁজে পাব না আর
যতই না কষ্ট জ্বালা সহি নিরবধি।
টলটলে নদীর জলে
অথবা চিক্ চিক্ বালুকাময় তীরে
জোছনামাখা কাকলিমুখর ভরদুপুর রাতে
সাথী, সখা, হে সখী
গল্প হবে না আর শত চেষ্টায়ও তোমাদের সাথে।
এখন আমার জীবন-যাপন ইটপাথরের চার দেয়ালে বন্দী
মুক্তি পাওয়া বড়ই দায়
প্রিয়জনের সাথে করিনা যতই সন্ধি।
তীরে এসে ভিড়েছে চোখ ধাঁধাঁনো পরকালের তরী
সাথী বন্ধু সখাসখী
চপল হরিণীর মত প্রেয়সীর আঁখি
এখন তোমাদের হারিয়ে জীবন সায়াহ্নে
আজ নীরবে নিভৃতে তোমাদের স্মরি
আর দিবানিশি চোখের জলে ভাসি।

সংসার

লিজা ফাহমিদা

যত্নে সাজানো বসার ঘরে
সিদ্ধার্থ ধ্যানে
দেয়ালের মাঝে ক্যানভাসে পরী
জল চোখে আনমনে।
রোদ ঝলমলে সকাল দুপুর
চড়ুই এর কার্নিশ,
বাতাসের সাথে জারুলের রং
যাপিত অহর্নিশ।
দরোজা জানালা শূন্য বাড়িতে
রঙিন পর্দা ওড়ে
সারাদিন শেষে রোদ নিভে যায়
আলো জ্বলে ওঠে ঘরে;
জীবন জীবিকা ছুটে চলা পথ
পাতা ঝরে যায় শীতে,
তবুও হৃদয়ে সংসার থাকে
অসীম প্রতীক্ষাতে।।

ছড়ায় ছড়ায় শুদ্ধ ভাষা — সুবলকুমার বণিক

লিখেছ তৎকালীন সঙ্গে সময়

লিখেছ ‘তৎকালীন’ সঙ্গে ‘সময়’
বাহুল্যদোষ এটা ব্যাকরণে কয়।
সময় বলছ যাকে সেটাই তো কাল
যে কোন একটি লেখো নেই গোলমাল।

[অনেকেই লেখেন ‘তৎকালীন সময়ে’। যেমন ‘তৎকালীন সময়ে জিনিসপত্রের দর সস্তা ছিল।’ কেউ লেখেন ‘চলাকালীন সময়ে’। যেমন, ‘সম্মেলন চলাকালীন সময়ে নিরাপত্তাব্যবস্থা জোরদার করা হবে।’ ‘সময়’ এবং ‘কাল’ একার্থক। সুতরাং দুটিকে একসঙ্গে না জুড়ে যে কোন একটি লিখতে হবে। ওপরে লিখিত দুটি বাক্যের প্রথমটির কথা ধরা যাক্। এই বাক্যে ‘তৎকালীন সময়ে’ না লিখে সহজেই লেখা যেত ‘তৎকালে’ কিংবা ‘সেই সময়ে’। দ্বিতীয় বাক্যটিতে লেখা যেত ‘সম্মেলন চলাকালীন’ কিংবা ‘সম্মেলন চলাকালে’ অথবা ‘সম্মেলন চলার সময়’। সুতরাং হয় ‘সময়’, নাহয় ‘কাল’ লেখো। এ দুটো শব্দকে অর্থহীনভাবে একসঙ্গে লিখো না।]

ভুল শুরু

মোঃ আমিরুল মোমেনীন

সেদিন সেই তপ্ত দিনের শুরু হয়েছিল মনে প্রশ্ন নিয়ে- জীবনের অসহায়তার কাছে মানুষের চেষ্টা আর কতকাল খুন হবে? ভার্সিটি গিয়ে কোন কিছুই ভাল লাগছিল না। সব বাদ দিয়ে আমি একাকী গিয়ে বসে ছিলাম মল চত্বরে। আকাশ ছিদ্র করে আগুন ঝরে পড়ছিল। পাতার জাফরি ছায়া ছেড়ে তরঙ্গ বাসটায় উঠে বসলাম পুরো ঘন ছায়া পাওয়ার আশায়। বাস ছাড়তে পঞ্চাশ মিনিট বাকি, তাই মল চত্বরে আমি ছিলাম একা। তপ্ত দুপুরের গায়ে প্রশ্নের লাল ছোপ, সেই সাথে একাকিত্ব, সব কিছু মিলে একটা ঘোর ঘোর লাগছিল। হঠাৎ ঘোর টুটে গেলো। ছেলেটাকে দেখলাম চার হাত-পায়ে হাঁটছে, হেঁটে হেঁটে বাসটার কাছে গিয়ে খুব কষ্ট করে বাসটায় উঠল। বুকে গরম লোহার ছেঁকা খেয়ে মুখের ভাঁজগুলো কোনভাবেই লুকিয়ে রাখতে পারছিল না। ওকে দেখলে আমার দর্শন থেমে যেতো, নিজেকে খুব অসহায় মনে হতো। বুক পকেট থেকে কাগজটা বের করলাম। বহুদিন ধরে ভাবছিলাম ছেলেটাকে নিয়ে লিখব।

দিনের সকল ক্লাসের সারবস্তু টুকে রাখতে সফোমোরদের জন্য শুধু একটা কাগজই যথেষ্ট ছিল। বুক পকেটে একটা কাগজ আর কিছু টাকা নিয়ে ভার্সিটি যেতাম। সেই কাগজটা বের করলাম। লেখা শুরু করলাম, ভেবেচিন্তে দুই শব্দের একটা বাক্য দিয়ে শুরু করলাম। বাক্যটি ছিল- 'অসহায় জীবন'। এরপর বাকি বাক্যগুলো লেখার জন্য অনেক চেষ্টা করেও আর কিছুই লিখতে পারলাম না। বার বার কলম ঘুরাচ্ছিলাম লেখা শব্দদুটির ওপর। ছেলেমেয়েরা বাসে উঠতে লাগলো, বাস ভরে গেলো, একটা সময় বাস ছেড়ে দিলো, কলম ঘুরানো বাদ দিয়ে কাগজটা বুক পকেটে রেখে দিলাম। জানালার ওপাশে খরতাপে ন্যুব্জ দৃশ্য একটার পর একটা ধীর লয়ে পিছনে সরে যাচ্ছে।

সলিমুল্লাহ রোডে নামলাম, হেঁটে নূরজাহান রোডে এলাম, সালাম দিয়ে দাঁড়িয়ে গেলাম, সামনে তনু ভাই (আসল নামটা বললাম না), ইতস্তত করে তিনিও দাঁড়ালেন। হাত মিলালাম, জানতে পারলাম- তিনি হেঁটে হেঁটে নূরজাহান রোড থেকে ধানমণ্ডি পনের নম্বর যাবেন। রাস্তার আড্ডাবাজি ছেড়ে নতুন চাকরি নিয়েছেন ধানমণ্ডির এক বায়িং হাউজে। হাত খরচ না, বায়িং হাউজ আপাতত তখন আঙুল খরচ দিচ্ছিল।

তনু ভাই এলাকার কনসার্টগুলোয় একটি দুটি গান গাইতে উঠতেন। গাইতে গাইতে খুব সুন্দরভাবে মাথার ক্যাপটা দর্শকদের দিকে ছুঁড়ে মারতে পারতেন। আরো অনেক কিছুই পারতেন, তারপরও জীবনের হতাশার কাছে পরাজিত হয়ে পড়লেন। কিন্তু পুরোপুরি হাল ছেড়ে দেননি।

তনু ভাইয়ের মুখটা ঘামে ভেজা ছিল, ভেজা ছিল চোখটাও। সেদিন তার বিশেষ প্রয়োজনে বাসায় আসতে হয়েছিল, আবার যাবেন অফিসে, কিন্তু টাকা নেই। এমন ধরনের অবস্থা প্রায়ই সৃষ্টি হচ্ছে। পরীক্ষার পর্ব চলছে তার জীবনে। জড় জীবনের আঁধার সুড়ঙ্গের ওপাশে নতুন একরাশ আলোর আশায় তিনি পণ করেছেন, শেষ দেখবেন তিনি।

এই দুপুরে নূরজাহান রোড থেকে হেঁটে হেঁটে ধানমণ্ডি পনেরো যাওয়া ভাবছিলাম- তনু ভাইয়ের অনেক দূর যেতে হবে, আজ এই আগুনঝরা দুপুরে তিনি যদি আধপথ গিয়ে আর না পারেন। হিসেব করে দেখলাম পকেটে যা আছে তা দিয়ে ধানমণ্ডি পনেরো সুন্দরমতো যাওয়া যাবে। তারপর এবং তারপর- বেশ জোরাজুরি, চাপাচাপি। একসময় জোর দিয়েই বললাম, 'তনু ভাই নিতেই হবে, দরকারে পরে দিয়া দিবেন।' এক মুঠে পকেটের সব কিছু তনু ভাইয়ের হাতে চেপে দিয়ে মুখ ঘুরিয়ে হাঁটতে শুরু করলাম। দ্রুত অনেক দূর এসে এমনিই একটু পিছনে তাকালাম, দেখি- তনু ভাই সেখানে তখনও ঠায় দাঁড়িয়ে আছেন, ঘাড় নিচু করে হাতের একটা কাগজের দিকে তাকিয়ে আছেন। ডায়েরির ছেঁড়া কাগজ, রং দেখে দূর থেকেই চিনতে পারলাম। শিরদাঁড়া বেয়ে একটা শীতল স্রোত নেমে এলো, তনু ভাইয়ের হাতে বুক পকেটের কাগজটাও গিয়েছে। এত দূর চলে গিয়েছিলাম যে চিৎকার দিয়েও বলতে পারলাম না, তনু ভাই, ওইটা ভুল শুরু, আমি আর আগাইতে পারি নাই, জীবন অসহায় ধইরা নিয়া আগানো যায় না।

লেখক: এডি, বিআরপিডি, বাংলাদেশ ব্যাংক

সেদিন সেই তপ্ত দিনের শুরু হয়েছিল মনে প্রশ্ন নিয়ে। সেকেন্ড ইয়ারের স্টুডেন্ট ছিলাম, ছিলাম যাকে বলে সফোমোর, ভাবতাম সব বুঝে ফেলেছি প্রায়। তাই পৃথিবীর প্রশ্নগুলোর সমাধান করার কাজে লেগে গিয়েছিলাম। কিন্তু- প্রতিটি দিন শেষ হতো না পারা আর না বোঝার বেদনা নিয়ে। কিছু কিছু দিনের শেষ জুড়ে থাকতো বিহ্বলতা, শুধু বেদনা নয়। এমন একটা দিনের ছোট এক ঘটনার প্রতিফলন আজো মনে অদ্ভুত ছায়া সৃষ্টি করে।

সহযোগিতা চুক্তি স্বাক্ষর

পরিবেশ ও সামাজিক ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক এবং ইন্টারন্যাশনাল ফিন্যান্স করপোরেশন (আইএফসি) এর মধ্যে ২৮ মে, ২০১৩ একটি সহযোগিতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। বাংলাদেশ ব্যাংকে অনুষ্ঠিত এ চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ ব্যাংকের পক্ষে গ্রিন ব্যাংকিং এন্ড সিএসআর ডিপার্টমেন্ট এর মহাব্যবস্থাপক মোঃ খুরশীদ আলম এবং আইএফসি'র পক্ষে কান্ট্রি ম্যানেজার (বাংলাদেশ, ভুটান ও নেপাল) কাইল এফ. কেলহোফার চুক্তি স্বাক্ষর করেন। অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর এস.কে.সুর চৌধুরী, নির্বাহী পরিচালক ম. মাহফুজুর রহমান, গ্রিন ব্যাংকিং এন্ড সিএসআর ডিপার্টমেন্টের উপ মহাব্যবস্থাপক খন্দকার মোরশেদ মিল্লাত ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ এবং আইএফসি বাংলাদেশের সিনিয়র কান্ট্রি অফিসার রেহান রশীদ ও অন্যান্য কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন।
স্বাক্ষরিত চুক্তি মোতাবেক জুন, ২০১৩ হতে ডিসেম্বর ২০১৪ সময়কালে বাংলাদেশ ব্যাংক এবং আইএফসি যৌথভাবে বাংলাদেশে বিদ্যমান পরিবেশ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা গাইডলাইন এর পর্যালোচনায় সামগ্রিক পরিবেশ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় সামাজিক ঝুঁকি অন্তর্ভুক্তকরণসহ গাইডলাইন হালনাগাদ করার কাজ সম্পাদন করবে। এছাড়া, পরিবেশ ঝুঁকির বিদ্যমান গুণগত পরিমাপকের পাশাপাশি সংখ্যাতাত্ত্বিক পরিমাপকের পদ্ধতি নিরূপণ, খাতভিত্তিক পরিবেশ ঝুঁকি নীতিমালা প্রণয়ন এবং পরিবেশ ঝুঁকি ও সামাজিক ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বিষয়ে প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল প্রস্তুতকরণ প্রভৃতি এ সহযোগিতা চুক্তির আওতায় অন্যতম কার্যক্রম হিসেবে সম্পাদন করা হবে।

মহাব্যবস্থাপক মোঃ খুরশীদ আলম ও কাইল এফ. কেলহোফার চুক্তি স্বাক্ষর করছেন

এক বছরের পথচলা

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

এক কথায় বলতে গেলে সম্পাদনা পরিষদে যারা আছেন তারা প্রত্যেকেই অক্লান্ত পরিশ্রম ও সম্পূর্ণ নিষ্ঠা দিয়ে এই পত্রিকাটি সুন্দর ও মনোমুগ্ধকর করে আমাদের সামনে উপস্থাপনের চেষ্টা করেন। যাতে পাঠক পত্রিকাটি দেখলেই তার পড়ার আগ্রহ তৈরি হয়। যতকিছুই বলি না কেন, আমাদের সকলের প্রচেষ্টার সাথে উপদেষ্টার মেধা ও ঐকান্তিক প্রচেষ্টার ফলেই আজকের বাংলাদেশ ব্যাংক পরিক্রমাটি এত সুন্দর সাবলীল, মনোমুগ্ধকর সর্বোপরি আকর্ষণীয় হয়ে পাঠকের সামনে হাজির হতে পারছে। আমাদের সকলের কষ্ট তখনই সফল হয় যখন পাঠক সমাবেশে এর প্রশংসা শোনা যায়। তাই নতুন আঙ্গিকে পথ চলার পরে শুরু করা হয়েছে পাঠক সমাবেশের মতো একটি আলোচনা অনুষ্ঠান। সেখানে বিজ্ঞ পাঠকগণ তাদের সুচিন্তিত মতামত অনায়াসে প্রকাশ করার সুযোগ পান। সেই সাথে সম্পাদনা পরিষদও তাদের দোষ-ত্রুটিগুলো বুঝতে পারেন এবং পরবর্তীতে তা শুধরানোর চেষ্টা করেন। গোলাম মহিউদ্দীন, উপ পরিচালক; নুরুন্নাহার, উপ পরিচালক; আজিজা বেগম, সহকারী পরিচালক; ইন্দ্রাণী হক, সহকারী পরিচালক প্রত্যেকেই আগ্রহের সাথে পরিক্রমার সাথে সম্পৃক্ত রয়েছেন।
সবশেষে সকলকে পত্রিকাটি সম্পর্কে গঠনমূলক আলোচনা-সমালোচনা করার জন্য পাঠক সমাবেশে উপস্থিত থাকার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি। আর সেই সাথে বেশি করে লেখা পাঠানোর জন্যও অনুরোধ করছি। কারণ আমরা বিশ্বাস করি এর সাথে যত বেশি মানুষ সম্পৃক্ত হবেন ততই এর মান আরও বৃদ্ধি পাবে।

বাংলাদেশ ব্যাংক পরিক্রমার সংবাদ তৈরির কলাকৌশল বিষয়ক একটি প্রশিক্ষণ কর্মসূচি ১২ জুন ২০১৩ প্রধান কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। এতে শাখা অফিসের প্রতিনিধিরা অংশ নেন। প্রশিক্ষণটি পরিচালনা করেন মিডিয়া বিশেষজ্ঞ ড. গোলাম রহমান, ভাষাবিদ সুবলকুমার বণিক ও আলোকচিত্রী নাসির আলী মামুন

২০১৩ সালে এসএসসিতে জিপিএ-৫

কাজী আফরিদা আহসান
ভিকারুননিসা নূন স্কুল এন্ড কলেজ

মাতা: সামসুন নাহার (এএম (ক্যাশ), মতিঝিল অফিস)
পিতা: এডভোকেট কাজী আহছান উল্যাহ

তাহমিনা আকতার
বায়েজিদ লেইন হাই স্কুল, চট্টগ্রাম (ব্যবসায় শিক্ষা)

মাতা: শিরিন আকতার
পিতা: মোঃ মন্নর আলী (জেএম (ক্যাশ), চট্টগ্রাম অফিস)

ফারহান তাজওয়ার (প্রিয়ন্ত)
বগুড়া জিলা স্কুল (বিজ্ঞান বিভাগ)

মাতা: ইয়াসমিন পারভীন
পিতা: মোঃ সাইফুল আলম (জেডি, বগুড়া অফিস)

আন্ নাজমুস সাকিব (অয়ন)
রাজউক উত্তরা মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজ (বিজ্ঞান বিভাগ)

মাতা: নাজমা শিরীন খান
পিতা: মোঃ আজমল হোসেন খান (জেডি, ডিবিআই-১, প্র.কা.)

সজীব মহাজন
কলেজিয়েট স্কুল, চট্টগ্রাম (বিজ্ঞান বিভাগ)

মাতা: পাপিয়া মহাজন
পিতা: দীপু রঞ্জন মহাজন (ডিডি, চট্টগ্রাম অফিস)

মোঃ রাগীব শাহরিয়ার
বগুড়া জিলা স্কুল (বিজ্ঞান বিভাগ)

মাতা: মোছাঃ রহিনুর বেগম
পিতা: মোঃ ওয়াহেদ আলী (এএম (ক্যাশ), বগুড়া অফিস)

মোহাম্মদ সাদমান সাকিব (আবির)
ন্যাশনাল আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা (ব্যবসায় শিক্ষা)

মাতা: সাহিনুর আক্তার
পিতা: মোঃ আবদুল কাদির (জেডি, ডিবিআই-১, প্র.কা.)

মিথিলা দাশ
বাংলাদেশ ব্যাংক কলোনী উচ্চ বিদ্যালয়, চট্টগ্রাম (ব্যবসায় শিক্ষা)

মাতা: সুতপা দেবী
পিতা: হরিমোহন দাশ (ডিএম, চট্টগ্রাম অফিস)

মোঃ ফয়সাল রহমান
ফয়জুল্লা উচ্চ বিদ্যালয়, বগুড়া (বাণিজ্য বিভাগ)

মাতা: মোছাঃ আসমানী খাতুন
পিতা: মোঃ লুৎফর রহমান (এএম (ক্যাশ), বগুড়া অফিস)

বি.এম.ফয়সাল
মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ (বিজ্ঞান বিভাগ)

মাতা: শাহিদা আক্তার
পিতা: মোঃ শামসুল হক-১৫ (ডিডি, ডিএমডি, প্র.কা.)

কিষানু রায় জয়
বাংলাদেশ ব্যাংক কলোনী উচ্চ বিদ্যালয়, চট্টগ্রাম (বিজ্ঞান বিভাগ)

মাতা: খুকু রাণী দেবী (ডিডি, চট্টগ্রাম অফিস)
পিতা: উৎপল কুমার রংদার (ডিডি, চট্টগ্রাম অফিস)

ইরতিজাউর রহমান আবির
বগুড়া জিলা স্কুল (বিজ্ঞান বিভাগ)

মাতা: রেশমা রহমান
পিতা: মোঃ মিজানুর রহমান-২ (এএম (ক্যাশ), বগুড়া অফিস)

এস এম আল-ফারুকী (সজীব)
রাজউক উত্তরা মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজ (বিজ্ঞান বিভাগ)

মাতা: আনোয়ারা খাতুন
পিতা: মোঃ আশরাফুল আলম (ডিজিএম, ডিবিআই-১, প্র.কা.)

মোঃ মাহমুদুল হাসান
বাংলাদেশ ব্যাংক কলোনী উচ্চ বিদ্যালয়, চট্টগ্রাম (ব্যবসায় শিক্ষা)

মাতা: রওশন আরা আক্তার
পিতা: মোঃ মোস্তফা (সিনিঃ কেয়ারটেকার, চট্টগ্রাম অফিস)

ফারজানা ফিজা বিভা
দি মিলেনিয়াম স্টারস স্কুল অ্যান্ড কলেজ, রংপুর (বিজ্ঞান বিভাগ)

মাতা: মোহমেনা রহমান
পিতা: মোঃ ফজলার রহমান (ডিডি, রংপুর অফিস)

মেহেজাবিন আফরোজ (মীম)
মনিপুর উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ, মিরপুর (বিজ্ঞান বিভাগ)

মাতা: মরহুমা নাজনীন আরা বেগম
পিতা: মোঃ মোয়াজ্জেম হোসেন (ডিডি, এবিডি, প্র.কা.)

তানজিনা আক্তার লিজা
বাংলাদেশ ব্যাংক কলোনী উচ্চ বিদ্যালয়, চট্টগ্রাম (বিজ্ঞান বিভাগ)

মাতা: রোকেয়া বেগম
পিতা: তাজল ইসলাম মজুমদার (সিনিঃ কেয়ারটেকার, চট্টগ্রাম অফিস)

মোঃ নূর-এ-আলম খান
গভঃ ল্যাবরেটরী হাই স্কুল, রাজশাহী (বিজ্ঞান বিভাগ)

মাতা: মোসাঃ নূরুন নাহার
পিতা: মোঃ মহবুব আলম খান (ডিএম, রাজশাহী অফিস)

২০১৩ সালে এসএসসিতে জিপিএ-৫

শরীফ মাহমুদ (ফাহাদ)
বাংলাদেশ ব্যাংক উচ্চ বিদ্যালয়, মতিঝিল (বাণিজ্য বিভাগ)

মাতা: মোসাঃ নাসরিন জাহান
পিতা: ফকির মোঃ আবু তাহের মিয়া
(এডি, আইএসডিডি, প্র.কা.)

মোঃ আশরাফুল করিম
মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ (ব্যবসায় শিক্ষা)

মাতা: আছমা আক্তার
পিতা: মোঃ রেজাউল করিম ভূঁইয়া
(ডিডি, ডিবিআই-২, প্র.কা.)

ওয়াকিল আহমেদ (দীপ্ত)
কদমতলা স্কুল অ্যান্ড কলেজ, পূর্ব বাসাবো (ব্যবসায় শিক্ষা)

মাতা: জিপ-সানোয়ারা বেগম
পিতা: মোঃ সলিমুল্লাহ ফেরদৌসী
(জেডি, ডিবিআই-২, প্র.কা.)

সৈয়দ জামি-উল-হক নাভিদ
সেন্ট যোসেফ সেকেন্ডারী হাই স্কুল, মোহাম্মদপুর (বিজ্ঞান বিভাগ)

মাতা: সৈয়দা শামীমা হক
পিতা: সৈয়দ আনোয়ারুল হক
(ডিডি, সিএসডি-২, প্র.কা.)

ফাহাদ আলম জয়
সামসুল হক খান স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ডেমরা (বিজ্ঞান বিভাগ)

মাতা: ফাতেমা বেগম
পিতা: মোঃ জাহাঙ্গীর আলম
(কেয়ারটেকার ১ম মান (ক্যাশ), মতিঝিল অফিস)

ইসফাক হোসেন ইফা
বাংলাদেশ ব্যাংক আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়, ফরিদাবাদ

মাতা: ফরিদা ইয়াসমীন
পিতা: মোঃ ইফতেখার হোসেন
(এডি, চেঞ্জ ম্যানেজমেন্ট এডভাইজার শাখা, প্র.কা.)

আনিকা নোশীন (মাহী)
মোহাম্মদপুর প্রিপারেটরী উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় (ব্যবসায় শিক্ষা)

মাতা: ফজিলাতুন নেছা
পিতা: মোঃ আব্দুল মতিন
(সিওএস (ডিডি), আইটিওসিডি, প্র.কা.)

সাবরিনা বিন্‌তে আজাদ
শহীদ বীর উত্তম লেফটেন্যান্ট আনোয়ার গার্লস কলেজ, ঢাকা (ব্যবসায় শিক্ষা)

মাতা: দিলরুবা রায়হান
পিতা: এ.কে.এম. মহিউদ্দিন আজাদ (ডিজিএম, এইচআরডি, প্র.কা.)

নূসরাত জেবিন দৃষ্টি
মতিঝিল মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজ (বিজ্ঞান বিভাগ)

মাতা: মাসুমা পারভীন
পিতা: মোঃ নূরুল ইসলাম
(ডিডি, এসএমডি, প্র.কা.)

সুতপা রায়
মতিঝিল সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় (বিজ্ঞান বিভাগ)

মাতা: সীমা রায়
পিতা: পবিত্র কুমার রায়
(ডিডি, সিএসডি-১, প্র.কা.)

অন্তরা সাহা কান্তা
মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ (ব্যবসায় শিক্ষা)

মাতা: কল্যাণী রানী সাহা (এএম (ইস্যু), মতিঝিল অফিস)
পিতা: শান্তি রঞ্জন সাহা
(জেডি, ডিওএস, প্র.কা.)

আশিক আহমেদ
বগুড়া ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজ এসএসসি : ২০১২

মাতা: হাছনা আলমগীর
পিতা: মোঃ বাদশাহ্ আলমগীর
(ডিএম, বগুড়া অফিস)

নাফিস সাদিক হোসাইন অনীক
মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ (বিজ্ঞান বিভাগ) এসএসসি : ২০১২

মাতা: মোসাম্মৎ নূরুন্নাহার সরকার
পিতা: মোঃ তফাজ্জল হোসেন
(জেডি, সিএসডি-২, প্র.কা.)

২০১২ সালে জেএসসিতে জিপিএ-৫

মোঃ মাশরুর সাকিব
ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজ

(সাধারণ গ্রেডে বৃত্তি লাভ)
মাতা: রোকেয়া খাতুন
(এএম, খুলনা অফিস)
পিতা: মোঃ মাহফুজুর রহমান

এ.কে.এম.নাঈমুর রহমান নাফিজ
মিলিটারী কলেজিয়েট স্কুল, খুলনা

মাতা: মোছাঃ মমতাজ পারভীন
পিতা: মোঃ আবদুল মান্নান
(ডিডি, মতিঝিল অফিস)

নওশিন জেরীন
ভিকারুননিসা নূন স্কুল এন্ড কলেজ

মাতা: শামীমা ফারজানা
(ডিএম, সদরঘাট অফিস)
পিতা: নুরুল হক

২০১২ সালে পিএসসিতে জিপিএ-৫

ইশরাত তাবাসসুম রোজা
শহীদ নজমুল হক উচ্চ বিদ্যালয়, রাজশাহী

(সাধারণ গ্রেডে বৃত্তি লাভ)
মাতা: দুলিয়ারা কবির
পিতা: মোঃ গোলাম কবির
(ডিএম (ক্যাশ), মতিঝিল অফিস)

মোঃ তওসিফ হাসান
খুলনা জিলা স্কুল

মাতা: রোকেয়া খাতুন
(এএম, খুলনা অফিস)
পিতা: মোঃ মাহফুজুর রহমান

২০১২ সালে পিএসসিতে জিপিএ-৫

ফারিহা ইসলাম
ভিকারুননিসা নূন স্কুল এন্ড কলেজ

মাতা: শিরাজাম মনীরা
পিতা: মোঃ রফিকুল ইসলাম-৬ (এএম (ক্যাশ), মতিঝিল অফিস)

সাজেদা আক্তার শাম্মী
বাংলাদেশ ব্যাংক আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়, ফরিদাবাদ

(ট্যালেন্টপুলে বৃত্তি লাভ)
মাতা: মিনা ইয়াসমিন
পিতা: শামছুল হক আযাদ (এএম (ক্যাশ), মতিঝিল অফিস)

শুভ্রতা কুন্ডু
ভিকারুননিসা নূন স্কুল এন্ড কলেজ

মাতা: নিবেদিতা কুন্ডু (এডি, এসএমই বিভাগ, প্র.কা.)
পিতা: কৃষ্ণ গোপাল কুন্ডু (জেডি, এইচআরডি, প্র.কা.)

তাসনুভা হাসান
ডাঃ খাস্তগীর সরকারী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়

মাতা: তানিয়া সুলতান
পিতা: মোঃ বিল্লাল হোসেন (ডিডি, ডিবিআই-২, চট্টগ্রাম অফিস)

তানভীর ফয়সাল স্পর্শ
মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ

মাতা: সাহিনা আক্তার
পিতা: মোঃ হামিদুল আলম (সখা) (ডিডি, ডিবিআই-২, প্র.কা.)

জান্নাতুল ফেরদাউস (আনিকা)
মহানগর আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ মুগদা, ঢাকা

মাতা: সাহিনুর আক্তার
পিতা: মোঃ আবদুল কাদির (জেডি, ডিবিআই-১, প্র.কা.)

খুলনা অফিস

ঋণ শ্রেণিকরণ ও প্রভিশনিং বিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ ব্যাংক খুলনা অফিসে ৯ জুন ২০১৩ ঋণ শ্রেণিকরণ ও প্রভিশনিং বিষয়ক দিনব্যাপী এক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ ব্যাংক ট্রেনিং একাডেমীর আয়োজনে এবং খুলনা অফিসের সহযোগিতায় অনুষ্ঠিত এ কর্মশালায় অফিসের ব্যাংক পরিদর্শন বিভাগ এবং বিভিন্ন তফসিলি ব্যাংকের ৪৩ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেন। কর্মশালায় বিআরপিডির বিভিন্ন সার্কুলারের আলোকে ঋণ শ্রেণিকরণ ও প্রভিশনিং এবং পুনঃতফসিলিকরণের বিষয়ে মতবিনিময় হয়। এ ছাড়াও কর্মশালায় ব্যাসেল-৩ এর বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ঋণ শ্রেণিকরণ বিষয়ে বিশেষ আলোকপাত করা হয়। অংশগ্রহণকারীরা জানান, ঋণ গ্রহীতাদের মধ্যে ঋণ পরিশোধে কালক্ষেপণের প্রবণতা এবং নীতিমালার সহজীকরণের প্রত্যাশা থাকলেও বাংলাদেশ ব্যাংকের বর্তমান সার্কুলারগুলো এই খাতে শৃঙ্খলা রক্ষা এবং তাদের পেশাগত দায়িত্ব পালনে সহায়ক হবে।

এ কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন খুলনা অফিসের মহাব্যবস্থাপক শ্যামল কুমার দাশ। সভাপতি ও রিসোর্স পারসন হিসেবে বিবিটিএ'র উপ মহাব্যবস্থাপক শেখ মোঃ সেলিম সেশন পরিচালনা করেন। তার সহযোগী ছিলেন বিবিটিএ'র যুগ্ম পরিচালক মোঃ মফিজুর রহমান খান চৌধুরী। কর্মশালার সার্বিক সমন্বয়ের দায়িত্ব পালন করেন খুলনা অফিসের উপ পরিচালক গোলাম সরোয়ার গাজী।

খুলনা অফিসের মহাব্যবস্থাপক ও বিবিটিএ'র প্রতিনিধিবৃন্দের সাথে ঋণ শ্রেণিকরণ ও প্রভিশনিং বিষয়ক কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী ব্যাংক কর্মকর্তাবৃন্দ

ব্যাংক পরিদর্শন সংক্রান্ত ঘরোয়া প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

খুলনা অফিসে ১৫ থেকে ১৭ এপ্রিল ২০১৩ ব্যাংক পরিদর্শন সংক্রান্ত ঘরোয়া (ইন হাউজ) প্রশিক্ষণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। ব্যাংক পরিদর্শন বিভাগ (উইং-১) এর ব্যবস্থাপনায় ব্যাংকের কনফারেন্স রুমে অনুষ্ঠিত তিনদিন ব্যাপী এ কর্মসূচির উদ্বোধন করেন মহাব্যবস্থাপক শ্যামল কুমার দাস। সহকারী পরিচালক থেকে যুগ্ম পরিচালক পর্যায়ের ২৫ জন কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন।

ব্যাংকিং সেক্টরের বর্তমান প্রেক্ষাপটে পরিদর্শন কার্যক্রমে ছক বাঁধা রিপোর্টের সাথে নিজস্ব মেধা, প্রজ্ঞা ও বিশ্লেষণী ক্ষমতার প্রয়োগের ওপরে গুরুত্বারোপ করে মহাব্যবস্থাপক তার উদ্বোধনী ভাষণে বলেন, অভিজ্ঞতা এবং জ্ঞান অর্জন ছাড়া দক্ষতার সাথে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহে পরিদর্শন পরিচালনা কঠিন। তাই প্রত্যেককে বাংলাদেশ ব্যাংক, সরকার ও বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সার্কুলার, বিবিধ সিদ্ধান্ত ইত্যাদি সম্পর্কে সজাগ থেকে দায়িত্ব পালন করতে হবে। প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে ব্যাংক পরিদর্শন বিভাগের উপ মহাব্যবস্থাপকবৃন্দ ব্যাংক পরিদর্শনের বিভিন্ন কলাকৌশল ও ব্যাংকের আর্থিক বিবরণী বিশ্লেষণের বিষয়ে কৌশলগত ধারণা প্রদান করেন।

এই প্রশিক্ষণে ইউসিপিডিসি ৬০০, ইনকোটার্মস, আমদানি-রপ্তানি নীতি, বৈদেশিক বাণিজ্য সংক্রান্ত বিবিধ অনিয়ম, বিশদ পরিদর্শনে প্রাপ্ত সাধারণ অনিয়মসমূহ, ঋণ শ্রেণিকরণ ও প্রভিশনিং, মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ এবং পরিদর্শন প্রতিবেদন পরিপালনের ওপর আলোচনা হয়। শেষ দিনে উন্মুক্ত আলোচনা ও প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে পরিদর্শনের কৌশলগত দিকগুলো সম্পর্কে সম্যক ধারণা দেয়া হয়।

খুলনা অফিস

"Rules of Origin for GSP, SAPTA, APTA, KPT and BIMSTEC and their application"

শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত

খুলনায় স্থানীয় ফ্রোজেন ফুড্স এক্সপোর্টার্স এসোসিয়েশনের সভাকক্ষে ৮ জুন, ২০১৩ Rules of Origin for GSP, SAPTA, APTA, KPT and BIMSTEC and their application শীর্ষক দিনব্যাপী একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। রপ্তানী উন্নয়ন ব্যুরোর আয়োজনে জাতীয় রপ্তানি প্রশিক্ষণ কর্মসূচি ২০১২-২০১৩ এর আওতায় এ সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে সেমিনারের উদ্বোধন করেন মহাব্যবস্থাপক শ্যামল কুমার দাস। প্রধান অতিথি তার উদ্বোধনী ভাষণে বলেন, বাংলাদেশের প্রধান দুই অর্থকরী সম্পদ চিংড়ি ও পাটশিল্পের জন্য খ্যাত দেশের তৃতীয় বৃহত্তম নগরী খুলনা। এ অঞ্চলের রপ্তানিকারকরা এডি ব্যাংক শাখার সহযোগিতায় রপ্তানি খাতে দেশের ব্যালান্স অব ট্রেড ও ব্যালান্স অব পেমেন্টে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। সেমিনারে আলোচ্যসূচির ওপর কী নোট পেপার উপস্থাপন করেন রপ্তানী উন্নয়ন ব্যুরো, ঢাকা এর পরিচালক আবুল কালাম আজাদ। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন মোঃ হুমায়ুন কবির, সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট, বাংলাদেশ ফ্রোজেন ফুড্স এক্সপোর্টার্স এসোসিয়েশন (বিএফএফইএ); মনোরঞ্জন বিশ্বাস, পরিচালক, রপ্তানী উন্নয়ন ব্যুরো, খুলনা। সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন বিএফএফইএ, খুলনা এর সহ সভাপতি এম. খলিলুল্লাহ। বিভিন্ন এডি ব্যাংক শাখা ও রপ্তানিকারক ও শিল্প উদ্যোক্তারা এ সেমিনারে অংশগ্রহণ করেন।

রপ্তানী উন্নয়ন ব্যুরো আয়োজিত সেমিনারের উদ্বোধন করেন বাংলাদেশ ব্যাংক, খুলনা অফিসের মহাব্যবস্থাপক শ্যামল কুমার দাস

ফরেন এক্সচেঞ্জ ট্রানজেকশন্স রিপোর্টিং শীর্ষক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

খুলনা অফিসের কনফারেন্স রুমে ১৯ থেকে ২১ মে, ২০১৩ অনুষ্ঠিত হয় ফরেন এক্সচেঞ্জ ট্রানজেকশন্স রিপোর্টিং শীর্ষক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি। বিবিটিএ'র আয়োজনে খুলনা অফিসের ব্যবস্থাপনায় বিভিন্ন এডি ব্যাংক শাখার ৩৭ জন কর্মকর্তা এবং খুলনা অফিসের বৈদেশিক মুদ্রা নীতি বিভাগের ৩ জন কর্মকর্তা সহ মোট ৪০ জন প্রশিক্ষণার্থী এ কোর্সে অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণের উদ্বোধন ও সমাপনী দিবসে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে সনদপত্র বিতরণ করেন মহাব্যবস্থাপক শ্যামল কুমার দাস।

তিনদিন ব্যাপী এই প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে বিবিটিএ এবং প্রধান কার্যালয়ের পরিসংখ্যান বিভাগের কর্মকর্তারা নির্ভুল এবং যথাযথ রিপোর্টিং এর ওপরে অংশগ্রহণকারীদের প্রশিক্ষণ দেন। সম্প্রতি চালু হওয়া অনলাইন ইএক্সপি মনিটরিং এবং অনলাইন টিএম ও আইএমপি মনিটরিং সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রশ্ন এবং সমস্যার সমাধানও দেয়া হয় এ প্রশিক্ষণ কর্মসূচির শেষভাগে আয়োজিত মতবিনিময় পর্বে। প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী একাধিক ব্যাংক প্রতিনিধি জানান পেশাগত দায়িত্ব পালনে এ প্রশিক্ষণে অর্জিত অভিজ্ঞতা তাদের জন্য সহায়ক হবে।

এসএমই এন্ড স্পেশাল প্রোগ্রামস্ বিভাগের কার্যক্রম শুরু

খুলনা অফিসে ১৭ এপ্রিল ২০১৩ থেকে এসএমই এন্ড স্পেশাল প্রোগ্রামস্ বিভাগের কার্যক্রম শুরু হয়েছে। বর্তমানে এ বিভাগের মোট কর্মবল ৫ জন। খুলনা অফিসে এ বিভাগের উপ মহাব্যবস্থাপক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন মোঃ আমজাদ হোসেন খান।

আগামী ৩১ জুলাই, ২০১৩ তারিখের মধ্যে নবগঠিত এ বিভাগ কর্তৃক বাংলাদেশ ব্যাংক, খুলনার আওতাধীন মোট ১০টি ব্যাংক শাখা পরিদর্শনের কর্মসূচি রয়েছে; ইতোমধ্যে ৪টি শাখায় পরিদর্শনের কাজ সমাপ্ত হয়েছে। এছাড়া মোবাইল মনিটরিং ও অন্যান্য কলাকৌশলের মাধ্যমে এ অঞ্চলের এসএমই লোন গ্রহীতাদের বিভিন্ন সুবিধা-অসুবিধার বিষয়ে মনোযোগ দিচ্ছে এ বিভাগ। খুলনা অঞ্চলের এসএমই কার্যক্রমকে আরও বেগবান করতে নবগঠিত এসএমই এন্ড স্পেশাল প্রোগ্রামস্ বিভাগ কার্যক্রম ভূমিকা রাখবে।

ঈদ-ই-মিলাদুন্নবী উপলক্ষে আয়োজিত প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ

পবিত্র ঈদ-ই-মিলাদুন্নবী (সঃ) উপলক্ষে খুলনা অফিসের বানিয়াখামার স্টাফ কোয়ার্টার জামে মসজিদে আয়োজিত প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান ১৮ জুন ২০১৩ খুলনা অফিসের কনফারেন্স রুমে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন মহাব্যবস্থাপক শ্যামল কুমার দাস। অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন বানিয়াখামার মসজিদ কমিটির সভাপতি এবং খুলনা অফিসের সহকারী ব্যবস্থাপক (ক্যাশ) আলহাজ্ব মোঃ মিজানুর রহমান।

উল্লেখ্য ২৬ ও ২৭ এপ্রিল ২০১৩ তারিখে অনুষ্ঠিত এ প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশ ব্যাংক স্টাফ কোয়ার্টারের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সন্তান এবং অফিসের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা অংশগ্রহণ করেন। শিশুদের জন্য প্রতিযোগিতার বিষয়গুলো ছিলো তেলাওয়াতে কালামে পাক, হামদ্-নাত, সাধারণ জ্ঞান, রচনা লিখন এবং হাতের লেখা। কর্মকর্তা-কর্মচারীরা মাসলা-মাসায়েল, রচনা লিখন, হামদ্-নাত ও সাধারণ জ্ঞান বিষয়ে অংশগ্রহণ করেন।

ময়মনসিংহ অফিস

এসএমই বিষয়ক মত বিনিময় সভা

বাংলাদেশ ব্যাংক ময়মনসিংহ অফিসের উদ্যোগে ময়মনসিংহ অঞ্চলের আওতাধীন বিভিন্ন ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের বিভাগীয় প্রধান, আঞ্চলিক প্রধান ও শাখা প্রধানদের নিয়ে ১৯ জুন, ২০১৩ এসএমই ঋণ নীতিমালা ও কর্মসূচি বিষয়ক এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। জেলার শিল্পকলা একাডেমীতে আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রধান কার্যালয়ের এসএমই এন্ড স্পেশাল প্রোগ্রামস্ বিভাগের মহাব্যবস্থাপক সুকোমল সিংহ চৌধুরী। তিনি তার বক্তব্যে এসএমই ঋণ বিতরণ ও এ খাতে খেলাপি ঋণ নিয়ন্ত্রণে সততা, নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে নারী ও অন্যান্য উদ্যোক্তা নির্বাচনের ওপর গুরুত্ব দেন। এছাড়াও তিনি এসএমই নীতিমালা ও গাইডলাইন অনুযায়ী যথাযথভাবে রিপোর্টিংয়ের বিষয়ে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে তৎপর হওয়ার পরামর্শ দেন। ময়মনসিংহ অফিসের মহাব্যবস্থাপক মোঃ আব্দুল হামিদ তার বক্তব্যে ঋণকে এক ধরনের উদ্যোগ হিসেবে আখ্যায়িত করে ভবিষ্যতে ঋণ বিষয়ক স্বচ্ছ ও নির্ভুল বিবরণী প্রদানের জন্য উপস্থিত ব্যাংকার ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের প্রতি আহ্বান জানান। এ মতবিনিময় সভায় একটি ডকুমেন্টারী প্রদর্শনসহ এসএমই ঋণ নীতিমালা, নারী ও অন্যান্য উদ্যোক্তা সৃষ্টি, এসএমই ঋণের বিভিন্ন খাত, ঋণ শ্রেণিবিভাগ, ঋণ প্রদান ইত্যাদি বিষয়ে বিশদ বক্তব্য প্রদান করেন প্রধান কার্যালয়ের এসএমই এন্ড স্পেশাল প্রোগ্রামস বিভাগের উপ মহাব্যবস্থাপক মোঃ আবুল বশর ও যুগ্ম পরিচালক এস এম মোহসীন হোসেন। বৃহত্তর ময়মনসিংহ জেলার বিভিন্ন ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের প্রায় ২৫০ জন কর্মকর্তা এ সভায় উপস্থিত ছিলেন।

মহাব্যবস্থাপক মোঃ আব্দুল হামিদ মতবিনিময় সভায় বক্তব্য রাখছেন

স্মৃতিময় দিনগুলো

(২য় পৃষ্ঠার পর)

না। তিনি এও মন্তব্য করেন যে, তোমরা দেওয়ান-ই-খাস এ বসে দেওয়ান-ই-আম এ অবস্থিত বিভাগগুলো পরিচালনা করছো কীভাবে? গভর্নর তাকে বোঝানোর চেষ্টা করেন যে, নির্বাহী পরিচালকগণ প্রত্যেকেই যেহেতু একাধিক বিভাগের দায়িত্বে রয়েছেন, তাই তাদের পক্ষে সকল বিভাগে বসা সম্ভব নয়। পরবর্তীতে গভর্নর, ডেপুটি গভর্নর ও নির্বাহী পরিচালকবৃন্দের মধ্যে আলোচনার প্রেক্ষিতে সিদ্ধান্ত হয়, প্রতিটি বিভাগের প্রতি সপ্তাহের কাজের বিবরণ ও উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি (যদি থেকে থাকে) স্ব স্ব বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত নির্বাহী পরিচালকের জ্ঞাতার্থে উপস্থাপন করা হবে। নির্বাহী পরিচালক এটি পর্যবেক্ষণ করে সন্তুষ্ট হলে পরবর্তী কার্যক্রমের জন্য তা সচিব বিভাগে পাঠানো হবে। এ বিষয়ে অন্যান্য বিভাগের মতো জনসংযোগ ও প্রকাশনা বিভাগ প্রতি সপ্তাহে বিবরণী তৈরি করে আমার কাছে উপস্থাপন করতো। বিভাগের সকলেই এর জন্যে শ্রম দিতেন। তবে এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা আবশ্যক যে, বিভাগের তৎকালীন উপ মহাব্যবস্থাপক এবং বর্তমানে মহাব্যবস্থাপক এফ এম মোকাম্মেল হক ঐ বিবরণী প্রস্তুতের জন্যে এর খসড়া নিয়ে প্রায়ই আমার সাথে আলোচনা করতেন। এই বিভাগের বিভিন্ন কাজে সম্পৃক্ত থাকাকালীন অনেক স্মৃতির মধ্যে এটি আমার কাছে স্মরণীয় হয়ে আছে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের তরুণ কর্মকর্তাদের উদ্দেশ্যে কিছু বলুন–

আমার ধারণা ও জানামতে, দেশের বিশেষ মেধাবী ও দক্ষ তরুণেরা প্রথম থেকেই বাংলাদেশ ব্যাংকে নিয়োজিত আছেন। বর্তমান তরুণ কর্মকর্তারাও এর ব্যতিক্রম নন। নিজেদের মেধা, প্রজ্ঞা, মননশীলতা ও শ্রমের দ্বারা এ প্রতিষ্ঠানটিকে উত্তরোত্তর উচ্চ অবস্থানে নিয়ে যাবার জন্য আমি তাদেরকে আহবান জানাচ্ছি এবং আশাবাদ ব্যক্ত করছি যে, তারা শুধু জাতীয় ক্ষেত্রে নয় বরং আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলেও এই ব্যাংকের দৃঢ় ও ইতিবাচক ভাবমূর্তি গড়ে তুলতে সক্ষম হবেন।

■ *পরিক্রমা নিউজ ডেস্ক*

লুৎফর রহমান সরকার স্মরণে

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

তিনি বিশ্বাস করতেন গণমাধ্যমে বাংলাদেশ ব্যাংকের সমালোচনা যত হবে ব্যাংকের অস্তিত্ব ততই দৃঢ় হবে অর্থাৎ ব্যাংক সঠিকভাবে পরিচালিত হবে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর থাকাকালীন সহকর্মীদের প্রতি ছিল তাঁর সহমর্মিতা। একবার একটি ফাইল নিয়ে তাঁর কক্ষে প্রবেশ করলে তিনি আমার পরিচয় জানতে চাইলেন। আমি যখন বললাম আমি ফাইন্যান্সিয়াল ইন্সটিটিউশন ডিপার্টমেন্ট এ কর্মরত, তিনি তখন হেসে বললেন ও আপনি 'নন ব্যাংক'। এরপর মোটামুটি তিনি আমাকে 'নন ব্যাংক' বলেই সম্বোধন করতেন। আমি যখন সিলেট অফিসের মহাব্যবস্থাপক হিসেবে দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলাম তখন তিনি সিলেট অফিস পরিদর্শনে যান, সেখানে অনেক লোক তাঁর সাথে দেখা করতে এসেছিল। তার মধ্যে খুব সাধারণ একজন লোক তাঁকে দেখতে চাইলে তিনি লোকটিকে কক্ষে প্রবেশের অনুমতি দিয়ে বললেন, ঐ লোকটি তাঁর এক সময়কার ড্রাইভার ছিল। লোকটির সাথে তাঁর আন্তরিক ব্যবহার দেখে অনুধাবন করা যায় তিনি সাধারণ মানুষের খুব কাছের একজন মানুষ ছিলেন। সিলেটে বাংলাদেশ ব্যাংক স্কুল পরিদর্শনে গেলে স্কুলের বাচ্চারা তাকে ডান হাত, বাম হাত দিয়ে, ঘাড়ের ওপর দিয়ে ফুল দিতে শুরু করে। স্কুল কর্তৃপক্ষ কিছুটা বিব্রত হয়ে পড়লে তিনি বলেন 'শিশুরাতো এভাবেই বাম হাতে, ঘাড়ের ওপর ফুল দিবে, এতে দোষের কিছু নেই। শিশুদের ডান হাত, বাম হাত সব হাতই সমান।'

তিনি ছিলেন সুবক্তা, ছিলেন রম্য লেখকও। জাতীয় কবিতা পরিষদের অনুষ্ঠানে টিএসসি চত্বরে তিনি ছিলেন নিয়মিত পাঠক। এই মানুষটি একইসাথে ছিলেন প্রাণচঞ্চল, সদাহাস্যমুখ, বিনয়ী এবং কর্মমুখর। তাঁর স্মৃতির প্রতি আমাদের অকৃত্রিম শ্রদ্ধা।

ফাইন্যান্সিয়াল স্ট্যাবিলিটি ডিপার্টমেন্ট এর প্রথম বর্ষপূর্তি

ডেপুটি গভর্নর এস. কে. সুর চৌধুরীর সাথে ফাইন্যান্সিয়াল স্ট্যাবিলিটি ডিপার্টমেন্ট এর কর্মকর্তাবৃন্দ

বৈশ্বিক অর্থনৈতিক অস্থিতিশীলতার প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের আর্থিক খাতের ক্রমবিকাশমান ধারা অব্যাহত রাখা এবং স্থিতিশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে উন্নত দেশগুলোর সাথে সামঞ্জস্য রেখে ডেপুটি গভর্নর এস. কে. সুর চৌধুরীর সুপারিশক্রমে ২০১২ সালের মে মাসে বাংলাদেশ ব্যাংকে ফাইন্যান্সিয়াল স্ট্যাবিলিটি ডিপার্টমেন্ট প্রতিষ্ঠা করা হয়। সূচনালগ্ন থেকে বিভাগটির মহাব্যবস্থাপক হিসেবে দেবাশিস চক্রবর্তী দায়িত্ব পালন করছেন। গত ২৯ মে ২০১৩ তারিখে বিভাগটি প্রথম বর্ষপূর্তি শেষে দ্বিতীয় বর্ষে পদার্পণ করেছে। বিভাগটি Macroprudential Policy Unit, Financial Stability Research Unit, Bank/FI Stress Watch Unit এবং Financial Market Stress Watch Unit এর মাধ্যমে নিজস্ব স্বকীয়তায় ভিন্ন মাত্রার কাজ করে যাচ্ছে যার বেশির ভাগই বিশ্লেষণধর্মী ও পর্যালোচনামূলক। এ বিভাগে নিয়মিতভাবে ব্যাংকগুলোর Stress Test Report পর্যালোচনা, Financial Stability Report প্রণয়ন এবং বিশ্ব ব্যাংকের সহায়তায় Financial Projection Model বাস্তবায়নের পাশাপাশি Macro Stress Testing, Contingency Planning বাস্তবায়ন, Countercyclical Capital Buffer, Capital Conservation Buffer, Systematically Important Bank Assessment, Real Estate Index, Interconnectedness Matrix এবং SEANZA Event Management সংক্রান্ত কার্যক্রম চলমান রয়েছে। বর্তমানে বিভাগটিতে ২ জন উপ মহাব্যবস্থাপক, ২ জন যুগ্ম পরিচালক, ৮ জন উপ পরিচালক এবং ৫ জন সহকারী পরিচালকসহ মোট ১৮ জন কর্মকর্তা রয়েছেন।

ব্যাংক ক্লাবের পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান

বাংলাদেশ ব্যাংক ক্লাব, ঢাকা আয়োজিত অভ্যন্তরীণ ক্রীড়া, সাহিত্য ও সঙ্গীত প্রতিযোগিতা-২০১৩ এর পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান ৪ জুন ২০১৩ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান কার্যালয়ের ব্যাংকিং হলে এ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন নির্বাহী পরিচালক মোহাম্মদ নওশাদ আলী চৌধুরী ও বিশেষ অতিথি ছিলেন মহাব্যবস্থাপক ড. আবুল কালাম আজাদ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ব্যাংক ক্লাবের সভাপতি মোঃ সহিদুল ইসলাম। প্রধান অতিথি বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের অভিনন্দন জানান এবং তাদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন।

বিবিটিএ'তে Leave Management System উদ্বোধন

বাংলাদেশ ব্যাংক আধুনিকীকরণ ও ডিজিটাল করার অংশ হিসেবে Online System এ নৈমিত্তিক ছুটির কাজ সম্পাদন করার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক ট্রেনিং একাডেমীতে Leave Management System ২৭ মে, ২০১৩ উদ্বোধন করা হয়। একাডেমীর কনফারেন্স রুমে এ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নির্বাহী পরিচালক মোঃ আতাউর রহমান। সভাপতিত্ব করেন মহাব্যবস্থাপক সেখ মোজাফফর হোসেন। প্রধান অতিথি মোঃ আতাউর রহমান একজন কর্মকর্তার নৈমিত্তিক ছুটি উপস্থাপনের মাধ্যমে Online এ বিবিটিএ'র *Leave Management System* এর উদ্বোধন করেন। অনুষ্ঠানে একাডেমীর মহাব্যবস্থাপকগণ সহ বিভিন্ন পদমর্যাদার কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন।

বিবিটিএ'তে Leave Management System উদ্বোধন

লোক সাহিত্যে আম

জুলফিকার মসুদ চৌধুরী

আম ভারতীয় উপমহাদেশের এক প্রকার সুস্বাদু ফল। এ উপমহাদেশে কয়েক হাজার বছর ধরে আমের চাষাবাদ চলছে। পৃথিবীর অন্য যে সব দেশে ভারতীয় উপমহাদেশের মত জলবায়ু রয়েছে যেমন, ব্রাজিল, ওয়েস্ট ইন্ডিজ, মেক্সিকো প্রভৃতি দেশেও আমের চাষ হয়ে থাকে। বর্তমানে পৃথিবীর প্রায় সমস্ত উষ্ণ প্রধান জলবায়ুর অঞ্চলগুলিতে আমের চাষাবাদ হয়।

মরক্কোর পর্যটক ইবনে বতুতা ১৪ শতকে আমের বর্ণনা লিপিবদ্ধ করেন। বাংলাদেশ ও ভারতে যে প্রজাতির আম চাষ হয় তার বৈজ্ঞানিক নাম Magnifera Indica. আমের বৈদিক নাম মাকন্দ।

আম নানাভাবে আমাদের লোককথা ও সাহিত্যে এসেছে,
লোক শাস্ত্র বলে, 'আমে বান, তেঁতুলে ধান'
লোক কথায় আম এসেছে এভাবে,

পৌষে কুশি, মাঘে বোল
ফাল্গুনে গুটি, চোতে আঁটি
বোশেখে কাটি কুটি, জৈষ্ঠে দুধের বাটি
আষাঢ়ে পুঁতে রাখি, শ্রাবণে বাজাই বাঁশি

রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন,

আমসত্ত্ব দুধে ফেলি তাহাতে কদলি দলি
সন্দেশ মাখিয়া দিয়া তাতে
হাপুস হুপুস শব্দ
চারিদিক নিস্তব্ধ
পিঁপড়া কাঁদিয়া যায় পাতে।

শিশু সাহিত্যে আম এসেছে এভাবে,

ঝড় এলো এলো ঝড়
আম পড় আম পড়
কাঁচা আম ডাঁসা আম
টক টক মিষ্টি
এই যা এলো বুঝি বৃষ্টি

আমের মৌসুমে বিরহী গৃহবধূর মনের আকুতি ফুটে এসেছে এদেশের লোক-সাহিত্য গীতিকায়

জ্যৈষ্ঠ না মাসেরে বন্ধু গাছে পাকা আম
আমার বন্ধু নাইরে দেশে কারে খাওয়াইতাম
আম খাইত, কাঁঠাল খাইত, খাইত গাহির দুধ
সামনে বসাইয়া সাধুর দেখতাম চাঁদ মুখ।

আবার এসেছে,

আম পাকিল, জাম পাকিল, পাকিল কাঁঠাল
আমার দেশের বন্ধু বিদেশ রইল, বুকে দিয়া শাল।

আরেকটি ছড়া থেকে আমের স্থান বুঝা যায় কেননা এটিতে প্রথমেই রয়েছে আমের নাম,

আম জাম আতা লেবু
নারিকেল কাঁঠাল কমলা
লিবু বেল আনারস
তাল ফুটি খিরাই আমড়া।

ডিজিএম, সিলেট অফিস

ফলের রাজা

আম বাংলাদেশ, আসাম (ভারত) ও মায়ানমারসহ ভারত উপমহাদেশের পূর্বাঞ্চলের স্থানীয় ফল।

প্রাচীনকালে আমের কদর আর গুরুত্ব বুঝাতে সংস্কৃত নামে নামকরণ করা হয় 'আম' যার অর্থ মজুদ খাদ্য বা রসদ। বিখ্যাত চীনা পর্যটক হিউয়েন সাং, যিনি ৬৩২ খ্রিস্টাব্দের মাঝামাঝি সময়ে ভারত ভ্রমণে এসেছিলেন, তিনি আম-কে সর্বপ্রথম বহির্বিশ্বে পরিচিত করান। দুনিয়ার প্রায় সব উষ্ণ অঞ্চলে আমের আবাদ হয়। বিশেষ করে ব্রাজিল, ওয়েস্ট উন্ডিজ আর আমেরিকায়। সংস্কৃতে টককে বলা হয় অম্ল বা অম্র। সেখান থেকে আম্র হয়ে আম। ইংরেজি ম্যাংগো শব্দটির উৎপত্তি তামিল শব্দ ম্যানগাই বা ম্যানকে থেকে। পর্তুগিজরা বলত ম্যানগো। ইতালিয়ান ভাষায় ম্যানগা শব্দটি প্রথম যুক্ত হয় ১৫১০ সালে। আমেরিকায় আমের আমদানি ঘটে সতের শতকে। বরফ দিয়ে সংরক্ষণ করতে না পারায় আমেরিকার লোকজন আমের আচার বানিয়ে রাখত।

ক্যাপসিকামের মতো দেখতে মিষ্টি মরিচ বেল পিপারকেও আচার বানিয়ে রাখত তারা। আচার বানিয়ে রাখা এসব ফলকে তারা বলত 'ম্যানগোস'। আঠার শতকে এই ম্যানগোস হয়ে গেল ম্যানগো। কত রকমের আম আছে দুনিয়ায়? আকার ও স্বাদভেদে হাজার রকমের। বাংলাদেশে আমের জন্য বিখ্যাত চাঁপাইনবাবগঞ্জ ও রাজশাহী। সেরা নামের আমের মধ্যে রয়েছে ফজলি, ল্যাংড়া, গোপালভোগ, হিমসাগর, লক্ষণভোগ, মোহনভোগ, রানিপছন্দ, বেগমপসন্দ, বাদশাপসন্দ। গবেষণাগারে উদ্ভাবিত উন্নত জাতের মজাদার আমের মধ্যে আছে বারি-১, বারি-২, বারি-৩, বারি-৪, আম্রপালি, মল্লিকা এবং দিনাজপুরের সূর্যপুরি। আর ভারতের সেরা আমের মধ্যে আছে আলফাঁসো, নীলম, বাঙ্গানপল্লী, মালগোরা, সুবর্ণরেখা, চোষা, দশেরি, ল্যাংগা, গুলাবখাস, বোম্বাই ইত্যাদি। আর দুই দেশে মিলে বাহারি নামের আম আছে কয়েকশ। বাদশাহি, আলমশাহি, বৃন্দাবনি, দিলশাদ, কোহিনুর, কোহেতুর, ওয়ানজান, ফেরদৌস পসন্দ, সুলতান পসন্দ, ক্ষীরসাপাতি, জাফরান, শ্রাবণী, ভাদুরিয়া, বিসমনি, ভরত, বিগা, ভোজ, গরম, ডায়মন্ড, নীলম, দোকশলা, বারোমাসি, মিছরিভোগ, তোতাপুরি, কপটভাঙ্গা, হাতিঝুল, গৌরজিৎ আরো কত কী! সেগুলোর দেখা হয়তো কালেভদ্রে মেলে। কিন্তু নামের বাহার তো আছে! দুনিয়ায় এত নাম আর জাতের ফল দ্বিতীয়টি নেই।

খাদ্য নিরাপত্তা ও খাদ্য ব্যবস্থা প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ

মাহ্‌বুব এলাহী আক্তার

চিত্র : খাদ্য ব্যবস্থা তিনটি ভিত্তি সূত্র : John Ingram, GECAFS IPO, University of Oxford, UK

বাংলাদেশ ১৫ কোটি মানুষের ঘনবসতিপূর্ণ একটি দেশ। স্বাধীনতার পর থেকে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার সাথে পাল্লা দিয়ে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি পেলেও এখন পর্যন্ত খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করা সম্ভবপর হয়ে উঠেনি। তবে এক্ষেত্রে যে অগ্রগতি পরিলক্ষিত হচ্ছে তাতে মনে হয় অদূর ভবিষ্যতেই খাদ্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করা সম্ভব। খাদ্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করা হলেই যে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত হবে তা জোর দিয়ে বলা যায় না। খাদ্য নিরাপত্তা প্রধানত খাদ্য ব্যবস্থার ওপর নির্ভরশীল যা মূলত তিনটি ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত: খাদ্যের পর্যাপ্ততা, খাদ্য অধিগত করার সামর্থ্য ও খাদ্যের সদ্ব্যবহার।

বিগত ১০ আগস্ট ২০১২ তে প্রকাশিত ইকোনমিস্ট ইন্টিলিজেন্স ইউনিটের প্রতিবেদনে লক্ষ্য করা যায় যে দক্ষিণ এশিয়ার ছয় দেশের মধ্যে খাদ্য নিরাপত্তায় বাংলাদেশের অবস্থা সবচাইতে নাজুক। বিশ্বের ১০৫টি দেশের এ সমীক্ষায় বাংলাদেশের অবস্থান ৮১তম। এ রিপোর্টে বাংলাদেশের শক্তিমানের যে তিনটি দিক উঠে এসেছে তা হলো পুষ্টিমান, কৃষি উৎপাদনে নিশ্চয়তা এবং কৃষকদের ঋণ প্রাপ্তির সুবিধা ও সহজলভ্যতা। সে বিষয়ে বলা চলে যে ২০১১-২০১২ অর্থবছরে সফলভাবে ১৩,১৩২.১৫ কোটি টাকার কৃষিঋণ বিতরণের মাধ্যমে বাংলাদেশ ব্যাংক খাদ্য ব্যবস্থার ওপর ইতিবাচক ভূমিকা রেখেছে। তথাপিও নেতিবাচক দিক হিসেবে যে বিষয়গুলো উঠে এসেছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে কৃষি গবেষণা ও উন্নয়নে সরকারের বরাদ্দের স্বল্পতা, খাবারে বৈচিত্র্যের অভাব, মাথাপিছু গড় বার্ষিক উৎপাদন কম হওয়া, আমিষ জাতীয় খাদ্যের স্বল্পতা, রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা ও সরবরাহে অপ্রতুলতা। সার্বিকদিক বিবেচনায় বলা চলে নেতিবাচক দিকগুলোয় নীতিগত বা পদ্ধতিগত দিক থেকে বাংলাদেশ ব্যাংকের খুব একটা প্রভাব নেই। তবে এ আঙ্গিকে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের পরোক্ষভাবে কিছু করার সামর্থ্য আছে বলে আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়। সেক্ষেত্রে খাদ্য ব্যবস্থা সম্পর্কে সার্বিক একটি ধারণা দেবার প্রয়াস থেকেই এই প্রবন্ধের সূত্রপাত।

পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে খাদ্য ব্যবস্থা মূলত তিনটি বিষয়ের ওপর নির্ভরশীল, ১) খাদ্যের পর্যাপ্ততা; ২) খাদ্য অধিগত করার সামর্থ্য এবং ৩) খাদ্যের সদ্ব্যবহার।

খাদ্যের পর্যাপ্ততা যে সকল বিষয়ের ওপর

নির্ভরশীল তার মধ্যে মুখ্য হলো উৎপাদন, বন্টন ও বিনিময়। খাদ্য উৎপাদনের মানদণ্ডে বাংলাদেশ উত্তরোত্তর প্রবৃদ্ধি অর্জন করে যাচ্ছে। ২০১১-১২ অর্থবছরে উৎপাদিত খাদ্য শস্যের পরিমাণ ৩৪.৭৯ মিলিয়ন মেট্রিক টন, যা ২০০৬-০৭ অর্থবছরের তুলনায় ২৩.৩৪ ভাগ বেশি। একই সাথে লক্ষ্য করা যায় যে ২০১১-১২ অর্থবছরের তুলনায় খাদ্য আমদানি কমেছে ৫৬.৬৭ ভাগ। এথেকে পরিলক্ষিত হয় যে উৎপাদনে শতভাগ নিশ্চিতকরণ সময়ের হিসাব মাত্র।

খাদ্য বন্টন বলতে মূলত উৎপাদিত খাদ্যের আন্তঃজেলা ভিত্তিক চাহিদা মোতাবেক বণ্টনের বিষয়টি উল্লেখ করা হচ্ছে। সরকারি খাদ্য গুদামের ধারণ ক্ষমতা দিন দিন বেড়ে চললেও তা এখনও খাদ্য সরবরাহে পর্যাপ্ততা অর্জন করে উঠতে পারেনি। সরকারি খাদ্য গুদামের বর্তমান ধারণ ক্ষমতা ১৬ লাখ ৫০ হাজার টন। যা ২০১১-১২ অর্থবছরে উৎপাদিত খাদ্য শস্যের অর্ধেকেরও কম। ২৫ ডিসেম্বর ২০১১ সালে সরকারি খাদ্য গুদামে মজুদ ছিল ১৫ লাখ ৭৭ হাজার টন খাদ্যশস্য যার মধ্যে চাল ছিল ১১ লাখ ৫১ হাজার টন। বস্তুত সরকারি খাদ্য গুদামের ধারণ ক্ষমতা উৎপাদনের তুলনায় কম থাকায় এক্ষেত্রে এক শ্রেনির অসাধু ব্যবসায়ী বিশেষ সুবিধা গ্রহণে সক্ষম হয়। এরা চাতাল মালিক নামে পরিচিত। চাতাল মালিকেরা অনেক ক্ষেত্রে ফসল জমিতে থাকা অবস্থায় বা ফসল ঘরে তোলার আগে নামমাত্র মূল্যে তা কিনে নেয় এবং ভবিষ্যতে অধিক লাভে বিক্রির আশায় তা মজুদ করে রাখে। খাদ্যশস্যের মূল্য একটি স্পর্শকাতর বিষয় কারণ উৎপাদনের তুলনায় বিক্রয়মূল্য কমে গেলে কৃষক ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সুতরাং একদিকে সরকারি খাদ্য গুদামের অপর্যাপ্ত ধারণ ক্ষমতা, অন্যদিকে চাতাল মালিকের দৌরাত্ম্য এবং সর্বোপরি পাশ্চাত্যের ন্যায় পণ্য বাজারের অনুপস্থিতি খাদ্য সরবরাহ প্রক্রিয়াকে ব্যাহত করে। যার চিত্র ফুটে উঠেছে ইকোনমিস্ট ইন্টিলিজেন্স ইউনিটের প্রতিবেদনে যেখানে আমরা খাদ্য সরবরাহে পর্যাপ্ততার ওপর ১০০ তে ২২.৪ নম্বর পেয়েছি।

বিনিময় বলতে এখানে বাজার সরবরাহকে বুঝানো হচ্ছে। সরবরাহ পর্যাপ্ত হলে বাজার মূল্য মানুষের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে থাকে। তবে এক্ষেত্রে লক্ষণীয় যে বাজারমূল্য যেন উৎপাদন খরচের সমান বা নিচে নেমে না যায়। যা নিশ্চিত করা সম্ভব সরকারি খাদ্য গুদামের ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধির ও খাদ্য শস্য সংগ্রহের মাধ্যমে। ২০১০-১১ অর্থবছরে ও ২০১১-১২ অর্থবছরে সরকার কর্তৃক ওএমএস ও ফেয়ার প্রাইস কর্মসূচির মাধ্যমে যথাক্রমে ১২ লাখ ৫০ হাজার টন ও ২২ লাখ টন খাদ্যশস্য বিতরণ করেছে। যার ফলে বর্তমানে খাদ্য মূল্যস্ফীতি সীমাহীন পর্যায়ে রয়েছে।

খাদ্য ব্যবস্থার দ্বিতীয় ভিত্তি হচ্ছে খাদ্য অধিগত করার সামর্থ্য। খাদ্যের পর্যাপ্ততা বিষয়টি সামষ্টিক অর্থনীতির সাথে জড়িত। অপরদিকে খাদ্য অধিগত করার সামর্থ্য ব্যষ্টিক অর্থনীতির সাথে জড়িত। অধিগত করার সামর্থ্য গৃহস্থালীর খাদ্য ক্রয় করার সামর্থ্য, আন্তঃগৃহস্থালী খাদ্য বরাদ্দ ও পছন্দের ওপর নির্ভরশীল।

বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার ৩১ ভাগ লোক হতদরিদ্র। বাজারে সরবরাহের পর্যাপ্ততা তাদের ক্রয়ক্ষমতা নিশ্চিত করে না। তার জন্য সামাজিক সুরক্ষা জালের আওতায় প্রতিবছর সরকার প্রচুর অর্থ ব্যয় করে। তবু স্থায়ী কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে ব্যর্থ হলে এ বিপুল সংখ্যক জনগোষ্ঠীর ক্রয়ক্ষমতা নিশ্চিত করা দুরূহ কাজ। ইকোনমিস্ট ইন্টিলিজেন্স ইউনিটের প্রতিবেদনে আমরা ক্রয়ক্ষমতায় ৩৩ নম্বর পেয়ে ৭৮তম অবস্থানে আছি।

আন্তঃগৃহস্থালী খাদ্য বরাদ্দে বলা হচ্ছে যে সকল পরিবার সুনির্দিষ্টভাবে সুষমখাদ্যের বরাদ্দ পাচ্ছে কিনা অর্থাৎ সহজলভ্যতা নিশ্চিত হচ্ছে কিনা। বাংলাদেশে মানুষ গড়ে প্রতিদিন প্রয়োজনের তুলনায় ২৯০ কিলোক্যালরি খাদ্য কম গ্রহণ করে। সুতরাং বরাদ্দের ব্যাপারটি এখনও নিশ্চিত করা যায়নি। ইকোনমিস্ট ইন্টিলিজেন্স ইউনিটের প্রতিবেদনে আমরা সহজলভ্যতায় ৩৭.৬ নম্বর পেয়ে ৮১তম অবস্থানে আছি।

পছন্দর বিষয়টি প্রাপ্যতার ওপর নির্ভরশীল। যেমন ধরা যাক একটি দরিদ্র পরিবারের খাদ্যের মধ্যে আজকের দিনে একটিমাত্র মাছ বরাদ্দ আছে। প্রশ্ন হলো মাছটি কে খাবে? অবশ্যই গৃহস্থালী পুরুষ সদস্যরা। মহিলারা আবহমান কাল থেকে ভাল জিনিসটি পুরুষের পাতে তুলে দেন। সুতরাং তাদের খাদ্য নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা যাচ্ছে না কারণ স্বামী সন্তানের পছন্দ মেটাতে তিনি সর্বদা ত্যাগে ব্যস্ত।

খাদ্য ব্যবস্থার তৃতীয় ভিত্তি হচ্ছে খাদ্যের সদ্ব্যবহার। খাদ্যের সদ্ব্যবহার খাদ্য পুষ্টিমান, সামাজিক মূল্যবোধ এবং খাদ্য সুরক্ষার ওপর নির্ভরশীল।

খাদ্য পুষ্টিমান খাদ্য নিরাপত্তার এক অপরিহার্য অংশ। ইকোনমিস্ট ইন্টিলিজেন্স ইউনিটের প্রতিবেদনে আমাদের শক্তিমানের মধ্যে পুষ্টিমান এর কথা উঠে এসেছে। তথাপি এদেশে শতকরা ২৬ ভাগ লোক অপুষ্টির শিকার। খাদ্য পুষ্টিমানের ক্ষেত্রে একটি উদাহরণ দেয়া যেতে পারে যা হলো ভোজ্য তেল দ্বারা সবুজ শাক সবজি রান্না করা হলে তা বিভিন্ন ভিটামিন প্রস্তুত করে। কিন্তু আমাদের ৩০ মিলিয়ন গৃহস্থালীর কতভাগের ভোজ্য তেল অধিগত করার ক্ষমতা আছে বা বর্তমানে রন্ধন প্রক্রিয়ায় ব্যবহার করছে সে বিষয়ে আমাদের নিকট কোন নির্ভরযোগ্য তথ্য নেই। এ ব্যাপারে প্রচার প্রচারণার বিকল্প কিছু নেই।

সামাজিক মূল্যবোধও খাদ্য নিরাপত্তায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে সক্ষম। বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় ধীরে ধীরে নাগরিক যান্ত্রিকতা প্রবেশ করছে এবং হারিয়ে যাচ্ছে সামাজিক মূল্যবোধ। এক সময় রেওয়াজ ছিল নিজ বাড়িতে ভাল কিছু রান্না হলে তা প্রতিবেশির বাড়িতে পাঠানো। আমরা এক যুগ আগেও এই মহানগরীতে এই চল লক্ষ্য করেছি যা কালের আবর্তে ধীরে ধীরে হারিয়ে যাচ্ছে। আর গ্রাম বাংলায় যেখানে নিজেরই দুমুঠো ঠিকমত জোটে না সেখানে সামাজিক মূল্যবোধ ধীরে ধীরে দুর্বল হয়ে পড়েছে।

সর্বোপরি খাদ্য সুরক্ষা যা খাদ্যমান ও নিরাপত্তার ওপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। ইকোনমিস্ট ইন্টিলিজেন্স ইউনিটের প্রতিবেদনে আমরা খাদ্যমান ও নিরাপত্তায় ৩০.৪ নম্বর পেয়ে ৯২ তম অবস্থানে আছি। বস্তুত আমাদের খাদ্য সংরক্ষণ করার ক্ষমতা কম। শহরের মত গ্রামে ঘরে ঘরে ফ্রিজ নেই। তাই সকালে রান্না করা খাবার রোদে অনেক সময় নষ্ট হয়ে গেলেও কৃষককে তাই খেয়ে মাঠে কাজ করতে হয়। অপরদিকে খাবার বিশেষ করে মাছ, মাংস ও ফলে ফরমালিনের মত ক্ষতিকর দ্রবাদি মেশানোর তথ্য, উপাত্ত ও প্রমাণ আমাদের খাদ্য নিরাপত্তার মানদণ্ডকে নিম্নগামী করেছে।

এখন প্রশ্ন হলো কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিসেবে এক্ষেত্রে আমাদের কি করার আছে। ২০১২-১৩ অর্থবছরে কৃষিখাতে আমরা ১৪,১৩০ কোটি টাকা ঋণ প্রদানের লক্ষ্য নিয়েছি। যার ফলে নিশ্চিতভাবে কৃষকদের ঋণ প্রাপ্তির সুবিধা ও সহজলভ্যতা বৃদ্ধি পাবে। ফলে যদি উৎপাদন বৃদ্ধি পায় তবে তা যেন সঠিকভাবে বাজারজাত হয় তা নিশ্চিত করার জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংকের পাক্ষিক বা মাসিক ভিত্তিতে কৃষি মন্ত্রণালয় ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও বিভাগের সাথে বৈঠক করে বাংলাদেশ ব্যাংকের গৃহীত পদক্ষেপ নিয়ে তার সম্ভাব্য ফলাফল তাদের সামনে তুলে ধরতে হবে এবং একই সাথে বাংলাদেশ ব্যাংকের এ সফলতার বিপরীতে সংশ্লিষ্ট সকলকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। সর্বোপরি বাজারে প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি ও অসাধু ব্যবসায়ীদের হাত থেকে কৃষককে রক্ষা করার জন্য দ্রুত পণ্য বাজার সৃষ্টি ও প্রতিষ্ঠার পেছনে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে। তবেই সার্বিক খাদ্য নিরাপত্তায় উন্নতি করা সম্ভবপর হবে।

লেখক: সহকারী পরিচালক,
এফআরটিএমডি, বাংলাদেশ ব্যাংক

প্রথম পর্ব

আদিম সমাজ

পৃথিবীতে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড কীভাবে শুরু হলো

আমাদের ঘরে টেলিভিশন চলছে। এতে টম এন্ড জেরি দেখতে দেখতে আমরা লাফিয়ে উঠছি। কখনো স্কাইপে ব্যবহার করে আমেরিকায় পড়তে যাওয়া বড় ভাইয়ার সাথে কথা বলছি। ই-মেইলে অর্ডার প্লেস করে দিলে এক ঘন্টার মধ্যে সুস্বাদু পিৎজা চলে আসছে। অস্ট্রেলিয়ার পার্থ স্টেডিয়ামে প্রিয় খেলোয়ার সেঞ্চুরি করার সাথে সাথে আমরা ফেইসবুকে সেগুলো লোড করে আনন্দ করতে পারছি। কিন্তু আমরা কি কখনো ভেবে দেখেছি যে আমাদের পূর্বপুরুষদের জীবন কীভাবে কেটেছে? তারাও কি এসব আনন্দ পেয়েছেন? তাদের সময় কী এসব ছিল?

আজ থেকে একশ' বছর আগে ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ ছিল না। মোবাইল ফোন তখন আবিষ্কারও হয়নি। কম্পিউটার আবিষ্কার হয়নি। মানুষ ছিল পুরোপুরি কৃষির ওপর নির্ভরশীল। তারা সারাদিন জমিতে কাজ করতেন আর দিনের শেষে একটু গল্পগুজব করে ঘুমাতেন। তবে যাঁরা ছিলেন অতি জ্ঞানী তাঁরা নানা জিনিস আবিষ্কারের চেষ্টা করতেন। সেসব জ্ঞানী লোকেরাই আমাদের জন্যে নানা জিনিস আবিষ্কার করেছেন। মাত্র একশ' বছর আগের অবস্থাই যদি হয় এমন, তাহলে এক হাজার বছর বা এক লাখ বছর আগে কী ছিল? ভাবতেও অবাক লাগে। হাজার হাজার বছর আগে যখন পৃথিবীতে মানুষের আবির্ভাব হয় তখন চারদিকে ভয়ংকর বনজঙ্গল ছিল। সেসব বনে নানা রকম হিংস্র পশু বাস করতো। তাছাড়া বিষাক্ত পোকামাকড়ও বনে অবাধে বিচরণ করতো। এরকম পরিবেশে মানুষের পক্ষে বেঁচে থাকা ছিল কঠিন। সেই কঠিন অবস্থা থেকে ধীরে ধীরে মানুষ পৌঁছে গেছে আজকের আধুনিক যুগে। এজন্যে মানুষকে অক্লান্ত পরিশ্রম করতে হয়েছে। পৃথিবীতে মানুষ হচ্ছে সবচেয়ে বুদ্ধিমান প্রাণী। আর এই বুদ্ধিকে কাজে লাগিয়ে মানুষ বৈরী পরিবেশকে আয়ত্ত করে। আগামীতেও এই প্রক্রিয়া চলবে। নতুন নতুন জিনিস আবিষ্কার করে মানুষ আরো এগিয়ে যাবে বহুদূর।

আদিম মানুষের জীবন ব্যবস্থা

আদিম যুগের মানুষের জীবন ব্যবস্থা কেমন ছিল? যুগে যুগেই মানুষের মনে এই প্রশ্নটা ছিল। এ বিষয়ে অনেক গবেষণা করে মানুষ জানতে পেরেছে যে, তাদের জীবন অনেক বিপদসংকুল ছিল। আদিম মানুষ গাছের কোটরে বা পাহাড়ের গুহায় বাস করতো। মাঝে মাঝেই হিংস্র পশুগুলো মানুষকে আক্রমণ করে খেয়ে ফেলতো। বেঁচে থাকার জন্যে গাছের ফলমূলই ছিল তাদের ভরসা। মাঝে মাঝে তারা পশুপাখি শিকার করে কাঁচা মাংস খেত।

মানুষ কীভাবে সমাজবদ্ধ হলো

মানুষ পশু শিকারের জন্যে পাথর দিয়ে অস্ত্র বানাতে শিখলো। তারা এখন সহজে পশু শিকার করতে পারে। অর্থাৎ পশুকে আঘাত করার মতো অস্ত্র তারা বানাল। কিন্তু পশু শিকারের জন্যে একা একা জঙ্গলে ঘুরতে গেলে হিংস্র জানোয়ারগুলো মানুষকে আক্রমণ করতো। তাদেরকে হত্যা করে খেয়ে ফেলতো। মানুষ লক্ষ্য করলো, জঙ্গলে একা যাবার বদলে দল বেঁধে গেলে পশুরা ভয় পায়। তখন হিংস্র পশুরাও আক্রমণ করতে সাহস পায় না। আবার একটি পশু হত্যা করা হলে অনেক মানুষ মিলে সেটি খাওয়া যায়। কারণ মৃত পশুর মাংস বেশিদিন রাখা যায় না। একা একা থাকার চেয়ে দল বেঁধে সমাজবদ্ধ হয়ে থাকার সুবিধা অনেক। এটা চিন্তা করেই মানুষ দলবদ্ধভাবে থাকা শুরু করল।

কৃষি আবিষ্কার

মানুষের জীবন তখনও ছিল বেদুইনদের মতো। তারা এক স্থানে বেশিদিন থাকতে পারতো না। কারণ এক স্থানে থাকা শুরু করলে অল্প সবময়ের মধ্যেই সে এলাকার ফলমূল শেষ হয়ে যেতো। তখন তাদেরকে বাধ্য হয়ে অন্য এলাকায় খাবারের সন্ধানে চলে যেতে হতো। এভাবে ঘুরতে ঘুরতে তারা আবার আগের স্থানেও ফিরে আসতো। এক পর্যায়ে মানুষ লক্ষ্য করল যে, গত বছর ফল খেয়ে যেসব আঁটি তারা মাটিতে ফেলে রেখে গেছে সেগুলো হতে সুন্দর চারা গজিয়েছে। দেখতে দেখতে কিছুদিন পর সেসব চারাগাছ বড় হচ্ছে এবং সেগুলো হতেও ফল পাওয়া যাচ্ছে। তখন মানুষের মনে ধারণা হলো কীভাবে চাষাবাদ করা যায়। কীভাবে জঙ্গলে জঙ্গলে খাদ্যের জন্যে না ঘুরে নিজেদের চাহিদা মতো খাবার নিজেরাই ফলাতে পারে। এভাবেই মানুষ কৃষিকাজ করতে শিখলো।

পশুপালন আবিষ্কার

জঙ্গল থেকে পশু শিকার করে সবাই মিলে পশুর মাংস খাওয়া ছিল একটা উৎসবের মতো। শুকনো বনে জোরে বাতাস বইতে শুরু করলে যখন দুটো গাছে ঘষা লাগে তখন কখনো কখনো আগুন জ্বলে ওঠে। ওই আগুন দ্রুত সারা বনে ছড়িয়ে পড়ে। কখনোবা অনেক পশুপাখি মারা যায়। মানুষ আগুনে ঝলসে যাওয়া সেসব মরা পশুর মাংস খেয়ে বুঝতে পারে যে ঝলসানো মাংস কাঁচা মাংসের চেয়ে সুস্বাদু। এদিকে পাথরে পাথরে ঠুকে অস্ত্র বানাতে গিয়ে মানুষ আগুন আবিষ্কার করে ফেললো। মানুষ দেখতে পেল, দুটো পাথর একসাথে ঠোকা দিলেই আগুন জ্বলে ওঠে। তখন পশুর কাঁচা মাংস আগুনে ঝলসে নিয়ে খেলে অনেক বেশি মজা পাওয়া যায়।
মানুষ বুঝতে পারলো যে জঙ্গলে দুধরনের পশু পাওয়া যায়। এগুলোর মধ্যে কতগুলো হচ্ছে হিংস্র। এরা মানুষকে আক্রমণ করে এবং মেরে ফেলে। আবার কিছু পশু আছে যেগুলো পোষ মানে, ঘাস-লতা-পাতা খায়। এসব পশু ধরতে পারলে সাথে

সাথে হত্যা না করে নিজেদের কাছে রাখা যায় এবং যেদিন অন্য কোন খাবার পাওয়া গেল না সেদিন হত্যা করে খাওয়া যায়। এই ধারণা থেকে মানুষ পশুপালন শুরু করলো। ক্রমে পশুপালন মানুষের জীবনধারণের একটি বড় উপায় হয়ে দাঁড়ালো।

গোত্রভিত্তিক বসবাস শুরু

মানুষ যখন দলবদ্ধ হয়ে কৃষি ও পশুপালনের ওপর নির্ভর করে বাঁচতে শিখলো তখন তারা দলে দলে ভাগ হয়ে বিভিন্ন স্থানে বসতি স্থাপন করলো। এক্ষেত্রে সাধারণত নদীর কাছাকাছি স্থানকে তারা বেছে নিতে শুরু করলো। কারণ নদীর পাশে জমি উর্বর থাকে বলে সহজে ফসল ফলানো যায়। নদী থেকে খাবার পানি সংগ্রহ করা যায়। তাছাড়া এক স্থান হতে অন্য স্থানে যাবার জন্যে নদীপথ অত্যন্ত সহজ।

দলবদ্ধভাবে বসবাসের ক্ষেত্রে দলের নেতার ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সবাই চায় একজন যোগ্য এবং ক্ষমতাসম্পন্ন নেতার অধীন থাকতে। এরকম এক একজন নেতার অধীন দলবদ্ধ হয়ে থাকা মানুষগুলোকে নিয়ে এক একটা গোত্রের সৃষ্টি হয়। ফলে গোত্রগুলোর কোনটি ছোট এবং কোনটি বড় হয়ে দাঁড়ায়।

জমির মালিকানা চালু

আদিম মানুষেরা দলবদ্ধ হয়ে গোত্রে গোত্রে বিভক্ত হয়ে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে শুরু করে। তখন তাদের বসবাসের জন্যে দরকার হয় ঘরবাড়ির। আবার চাষাবাদের জন্যে দরকার হয় জমির। যার দখলে যত বেশি জমি থাকে তার তত বেশি সুবিধা। তারা সকলেই বেশি বেশি জমির মালিকানা দখল করতে চায়। বেশি জমি থাকলে তারা সহজেই নানা ধরনের ফসল আবাদ করতে পারে। এতে করে তাদের আর খাদ্যের কোন চিন্তা থাকে না। এভাবেই আদিম সমাজে জমির মালিকানা চালু হয়।

দাসপ্রথা চালু

জমির মালিকানা চালুর পর বেশি জমি দখলের আগ্রহও বেড়ে যায়। ইতিপূর্বেই মানুষ যাযাবর জীবন ছেড়ে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে শিখেছে। তখন আরো বেশি জমি দখলের উদ্দেশ্যে তারা ক্ষুদ্র ও দুর্বল গোত্রগুলোর উপর আক্রমণ করতে শুরু করে। এভাবে দুর্বল গোত্রগুলোকে পরাস্ত করে তাদের জমি দখল করে নেয়া শুরু হয়। পরাজিত গোত্রের নেতাদের তারা হত্যা করে। আর সেসব গোত্রের অন্য সদস্যদেরকে দাস বানিয়ে রাখা হয়। দাসদেরকে ওরা বেঁধে রাখতো, নানা কাজ করতে দিত। তাদের সাথে পশুর মতো আচরণ করা হতো। দাসদের কোন আবদার শোনা হতো না। দাসদেরকে এক সময় বাজারে বিক্রিও করা হতো। পরাজিত মানুষদের দাস বানিয়ে রাখার এই প্রথা দীর্ঘদিন চালু ছিল।

■ *পরিক্রমা নিউজ ডেস্ক*

প্রশ্ন ঃ বাংলাদেশের লোকজন এত গরীব হওয়ার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক দায়ী। কারণ বাংলাদেশ ব্যাংক কেন টাকা ছাপিয়ে সবাইকে দিয়ে দেয় না ?

– দুরদানা মাহফুজ শ্রেয়া

নবম শ্রেণি, ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজ

পিতা: ম. মাহফুজুর রহমান

(নির্বাহী পরিচালক, প্রধান কার্যালয়)

আচ্ছা বাবু তোমার তাই মনে হয় ? আর আমি বলছি এজন্য বাংলাদেশ ব্যাংক দায়ী নয়। কেন জান ? মনে করো বাংলাদেশ ব্যাংক যত ইচ্ছা তত টাকা ছাপিয়ে সবাইকে দিয়ে দিল। এখন কি হবে ? টাকা পেয়ে সবাই মার্কেটে যাবে। সবাই যদি মার্কেটে যায় একই সাথে যেমন - ঈদের সময় যায় তখন কি হয় ? জিনিসপত্রের দাম বেড়ে যায়। সেভাবে অনেক টাকা সবার হাতে থাকলে জিনিসপত্রের দাম এতটাই বেড়ে যাবে যে তুমি এক ব্যাগ টাকা দিয়ে ছোট একটা বল কিনতে পারবে। কারণ বাজারে তো এতো বল নেই। আর তোমাদের মত বাবুরা সবাই বল কিনতে চায়। এ কারণে বাংলাদেশ ব্যাংক একটা প্ল্যান করে। সে কি করে জানো ? আগামী বছরে বাংলাদেশের সব মানুষের নতুন জিনিসপত্র কিনতে কত নতুন টাকার দরকার হবে তার একটা প্ল্যান করে। সে প্ল্যান কয়েকটি বিষয়ের ওপর নির্ভর করে তৈরি হয়। যেমন - নতুন বছরে কত নতুন জিনিসপত্র (খাবার, কাপড়-চোপড়, খেলনা, লেখাপড়া, চিকিৎসা, বেড়ানো, এসব কাজের জন্য কত নতুন টাকার দরকার তার একটা প্ল্যান করে; এবং এক বছরে একটা টাকা কতবার হাত বদল করল মানে তোমার কাছ থেকে অন্যজন পেল তার কাছ থেকে আর একজন পেল। এই নাম্বারগুলো যোগ করলে একটা নাম্বার পাবো না ? সেই নাম্বারটাই হচ্ছে ম্যাজিক নাম্বার। মনে কর পাওয়া গেল যে, আগামী বছরে আমাদের গত বছরের তুলনায় আনুমানিক ৮০ হাজার কোটি নতুন টাকা লাগবে। এখন বাংলাদেশ ব্যাংক গাজীপুরে আমাদের টাকশাল থেকে সেই পরিমাণ টাকাই ছাপাবে। একটা কথা মনে রেখ, আমরা যে এক টাকার, দুই টাকার নোট এবং কয়েন দেখি না? সেটা কিন্তু বাংলাদেশ ব্যাংক নয় বাংলাদেশ সরকার ছাপায়। তাহলে বাংলাদেশ ব্যাংক যদি অনেক অনেক বেশি নতুন টাকা ছাপায় যেমনটা তুমি বললে, তখন কয়েকটা ভয়ঙ্কর ঘটনা ঘটবে। টাকার কোন মূল্য থাকবে না। টাকার দাম গাছের পাতার মত হয়ে যাবে। গাছের পাতা দিয়ে কিছু কিনতে পার ? পাতা দিয়ে যেমন কিছু কেনা যায় না তেমন টাকা দিয়েও কিছু কেনা যাবে না। এছাড়াও বাংলাদেশ ব্যাংকের নিজস্ব একটা কারণ আছে; সে কারণে যত ইচ্ছা তত টাকা ছাপাতে পারে না। বড় হলে বুঝবে যে টাকা ছাপালেই বাংলাদেশ ব্যাংকের দায় বেড়ে যায়। কিভাবে? কখনো দেখেছো যে নোটে লেখা থাকে চাহিবামাত্র ইহার বাহককে ৫০০ টাকা দিতে বাধ্য থাকবে। একারণে যত নোট ছাপায় সে নোটের বিপরীতে তত সম্পত্তি থাকতে হবে বাংলাদেশ ব্যাংকের যাতে কেউ চাইলেও সে টাকা দিয়ে দিতে পারে। সেই পরিমাণ সম্পদ যদি বাংলাদেশ ব্যাংকের না থাকে। যেমন - স্বর্ণ, বিদেশি টাকা থাকতে হবে। অত স্বর্ণ বাংলাদেশ ব্যাংক কোথায় পাবে ? সে পরিমাণ স্বর্ণ যদি না থাকে তাহলে বাংলাদেশ ব্যাংক বিপদে পড়বে। আর যদি বাংলাদেশ ব্যাংক বিপদে পড়ে বাংলাদেশের মানুষ আরও গরীব হয়ে যাবে। কারণ বাংলাদেশ ব্যাংক সরকারের সাথে পরামর্শ করে দেশের উন্নতির জন্য অনেক কাজ করে। সে সম্বন্ধে আর একদিন বলব। কেমন ? তাহলে বুঝলে এখন, কেন বাংলাদেশ ব্যাংক যত ইচ্ছা তত টাকা ছাপিয়ে সবাইকে দিতে পারে না ? ধন্যবাদ তোমাকে এত সুন্দর প্রশ্ন করার জন্য।

উত্তর দিয়েছেন- ড. সায়েরা ইউনুস, ডিজিএম

চীফ ইকোনোমিস্ট ইউনিট, বাংলাদেশ ব্যাংক

ছোট্ট বন্ধুরা! বাংলাদেশ ব্যাংক, ব্যাংকিং ও অর্থনীতির যে কোন বিষয়ে তোমরা প্রশ্ন পাঠাতে পার এই ঠিকানায়– মহাব্যবস্থাপক, ডিসিপি, প্র.কা. অথবা ই-মেইল bank.parikroma@bb.org.bd

নতুন আঙ্গিকে
বাংলাদেশ ব্যাংক পরিক্রমা

এক বছরের পথ চলা

পরিক্রমা নিয়ে উপদেষ্টা ও বিভাগীয় সম্পাদকদের মধ্যে আলোচনা

'বাংলাদেশ ব্যাংক পরিক্রমা' একটি মাসিক ঘরোয়া পত্রিকা। ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর থেকে দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংক এর পথচলা। আর ১৯৭২ সাল থেকেই বাংলাদেশ ব্যাংক পরিক্রমার দেখা মেলে। গত এক বছর ধরে বাংলাদেশ ব্যাংক পরিক্রমাটি নতুন গেটআপ-মেকআপ নিয়ে প্রত্যেক পাঠকের কাছে মাসের প্রথম সপ্তাহেই হাজির হওয়ার চেষ্টা করে। প্রতি মাসে চার রঙে রঞ্জিত এই ব্যাংক পরিক্রমা পাঠকের মনে ক্রমশ আগ্রহের সৃষ্টি করেছে। কিন্তু কী ভাবে, কোন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে, কাদের আন্তরিক প্রচেষ্টা ও শ্রমের বিনিময়ে এই পত্রিকাটি পাঠকপ্রিয় হচ্ছে সেটা কী আমরা জানি?

একটু জেনে নেয়া যাক– প্রধান কার্যালয়ের ডিপার্টমেন্ট অব কমিউনিকেশন্স এন্ড পাবলিকেশন্স বাংলাদেশ ব্যাংকের সকল প্রকাশনার মুদ্রণ কাজের দায়িত্ব পালন করে থাকে। বিগত বছরগুলোতে প্রত্যেক শাখা অফিস থেকে বিভিন্ন সংবাদ বিচ্ছিন্নভাবে ডিপার্টমেন্ট অব কমিউনিকেশন্স এন্ড পাবলিকেশন্স-এ এসে জমা হতো, বর্তমানেও ডিপার্টমেন্ট অব কমিউনিকেশন্স এন্ড পাবলিকেশন্স-এ জমা হচ্ছে। এখন পরিক্রমার সম্পাদনা পরিষদসহ ১২ জন প্রত্যক্ষভাবে কাজ করলেও এদের সাথে পরোক্ষভাবে জড়িত আছেন বাংলাদেশ ব্যাংকের বিভিন্ন বিভাগের এবং শাখা অফিসের কর্মকর্তাগণও।

আষাঢ়-শ্রাবণের বর্ষণ গ্রীষ্মের তপ্ত-শুষ্ক মাটিকে ভিজিয়ে কোমল করে তোলে। বাদল দিনের আর্দ্র কোমল হাওয়া সবার তাপদগ্ধ প্রাণে বুলিয়ে দেয় প্রশান্তির পরশ। জীবনের এমন সর্বব্যাপী আবাহনই বর্ষাকে আমাদের জনজীবনে আদরণীয় করেছে। বাঙালির সৃজনশীলতায় যুগে যুগে তাই বর্ষাবন্দনায় যেমন কোনো ক্লান্তি নেই ঠিক তেমনি বাংলাদেশ ব্যাংক পরিক্রমাকে গত এক বছরে সৃজনশীলতায়, নতুনত্বে ও আকর্ষণীয় করতে সংশ্লিষ্ট সম্পাদনা পরিষদের কোনো ক্লান্তি বা বিরাম নেই।

সম্পাদনা পরিষদের উপদেষ্টা ম. মাহফুজুর রহমানের আন্তরিক প্রচেষ্টা, অক্লান্ত পরিশ্রম, ক্লান্তিহীন-বিরামহীন নির্দেশনা ও উৎসাহেই পরিষদের সম্পাদক এফ.এম. মোকাম্মেল হক থেকে শুরু করে সকল সদস্য নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন। বিভাগীয় সম্পাদকগণের প্রত্যেককে কাজ ভাগ করে দিক নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। প্রত্যেকে সে নির্দেশনা অনুযায়ী যথাসময়ে কাজ সম্পাদন করার ঐকান্তিক চেষ্টা করেন। এক্ষেত্রে প্রথমেই বলতে হয় মহাব্যবস্থাপক মোঃ মিজানুর রহমান জোদ্দার এর কথা। তিনি কবিতা ও সাহিত্য সম্পাদনার কাজটি করে থাকেন। সাহিত্যানুরাগী এই মানুষটি অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে কবিতা, গল্প, ভ্রমণকাহিনী নির্বাচন ও সম্পাদনা করেন। উপ

পরিক্রমার সম্পাদনা পরিষদের নিয়মিত সভা

মহাব্যবস্থাপক মোঃ জুলকার নায়েন প্রবন্ধ ও নিবন্ধ তৈরি ও সম্পাদনা করেন। উপ মহাব্যবস্থাপক সাঈদা খানম– তিনি সংবাদ সম্পাদনা করেন। যুগ্ম পরিচালক মহুয়া মহসীন– সমস্ত পরিক্রমাটি তার প্রাথমিক তত্ত্বাবধানে সম্পন্ন হয়ে থাকে। তাকে সার্বিকভাবে সহযোগিতা করে থাকেন সহকারী পরিচালক আজিজা বেগম। অত্যন্ত সৃজনশীলতার সাথে পত্রিকাটির প্রতিটি পৃষ্ঠা ডিজাইন করে দৃষ্টিনন্দন রূপ দেন মোহাম্মদ আবু তাহের ভূঁইয়া। প্রচ্ছদ তৈরির সাথে সম্পৃক্ত আছেন গ্রাফিক্স ডিজাইনার বিশ্বাস এ মালেক টিপু।

(১২ পৃষ্ঠায় দেখুন)

বাংলাদেশ ব্যাংক পরিক্রমার সম্পাদনা পরিষদের নিয়মিত সভা

গ্রাফিক্স সেকশনে চলছে পত্রিকাটির পৃষ্ঠা সজ্জার কাজ

বাংলাদেশ ব্যাংকের ডিপার্টমেন্ট অব কমিউনিকেশন্স এন্ড পাবলিকেশন্স এর মহাব্যবস্থাপক এফ. এম. মোকাম্মেল হক কর্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত
ফোন : ৯৫৩০১৪১; ই-মেইল : bank.parikroma@bb.org.bd; ওয়েবসাইট : www.bb.org.bd; মুদ্রণে : অলিম্পিক প্রোডাক্টস প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং, ১২৩/১, আরামবাগ, ঢাকা।